# বঙ্গভবন

## উদ্বোধন স্মারণিকা

২৭ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

## বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কাছাড় জেলা সমিতি, শিলচর

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

# ‘বঙ্গভবন’

## উদ্বোধন স্মরণিকা

২৭ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
১৪ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

ভবন উদ্বোধক
**শ্রী গৌতম রায়,** মন্ত্রী, জনস্বাস্থ্য কারিগরী, আসাম সরকার

মুখ্য অতিথি
**শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়,** কথাসাহিত্যিক, কলকাতা

সম্মানিত অতিথি
**শ্রী অজিত সিং,** মন্ত্রী, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, আসাম সরকার
**শ্রীমতী সুস্মিতা দেব,** সাংসদ, শিলচর লোকসভা কেন্দ্র

অনুষ্ঠান সভাপতি
**তৈমুর রাজা চৌধুরী,** কাছাড় জেলা সমিতি

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
অরুণকুমার চন্দ রোড, শিলচর-৭৮৮ ০০১

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

# ‘বঙ্গভবন’

সম্প্রসারিত বঙ্গভবন উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা

**প্রকাশ: ২৭ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, (১৪ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ)**

## কার্যকরী সমিতি, কাছাড় জেলা :

সভাপতি : **তৈমুর রাজা চৌধুরী,** সহ-সভাপতি : **সঞ্জীব দেবলস্কর, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল,**

সম্পাদক : **দীপক সেনগুপ্ত,** সহ-সম্পাদক : শৈবাল গুপ্ত, শতদল আচার্য, কোষাধ্যক্ষ : **জয়ন্ত দেবরায়**

সাহিত্য সম্পাদক : **তমোজিৎ সাহা,** সংস্কৃতি সম্পাদক : **অজয় চক্রবর্তী**

সদস্য : **দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, সুবীর কর, শ্যামলকান্তি দেব, মোজাম্মিল আলী লস্কর, পরিতোষ দে, গৌতমপ্রসাদ দত্ত, প্রদীপ আচার্য, দিলীপ নাথ, শান্তনু দাস, সব্যসাচী পুরকায়স্থ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অনিল পাল, লুৎফা আরা চৌধুরী।**

## স্মরণিকা উপসমিতি

সম্পাদক : **সঞ্জীব দেবলস্কর**

সদস্য : **সুবীর কর, বিভাসরঞ্জন চৌধুরী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি নাথ, গৌতমপ্রসাদ দত্ত, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, প্রদীপ আচার্য, তমোজিৎ সাহা।**

প্রকাশক : **দীপক সেনগুপ্ত,** সম্পাদক, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন,
কাছাড় জেলা সমিতি, ‘বঙ্গভবন’, অরুণকুমার চন্দ রোড, শিলচর-৭৮৮ ০০১

প্রচ্ছদ : **করুণা সিনহা**

স্থির চিত্র : **স্বপন রায়, পার্থ শীল।**

মুদ্রক :
**শিলচর সানগ্রাফিক্স, প্রেমতলা, শিলচর-১**

Banga Bhawan, a Souvenir published on the occasion of inauguration of extended Banga Bhawan, at A.K. Chanda Road, Silchar on 14th November, 2014, by **Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammalen,** Edited by **Sanjib Deb Laskar,** Published by **Dipak Sengupta,** Secretary, Cachar District Committee of the sammelan and Printed at **SILCHAR SUNGRAPHICS**, Premtola, Silchar-1.

# সম্প্রসারিত বঙ্গভবন-এর নির্মাণ উপসমিতি

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | তৈমুর রাজা চৌধুরী |
| কার্যকরী সভাপতি | : | সুজন দত্ত |
| আহ্বায়ক | : | দীপক সেনগুপ্ত |
| সদস্য | : | আশিস কুমার গুপ্ত, বিশ্বদীপ চক্রবর্তী, মহিতোষ পাল (আশু), শ্যামলকান্তি দে, প্রদীপ আচার্য, পরিতোষ দে, দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, শান্তনু দাস, সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, রন্টু বাগচী, দিলীপ নাথ, সুশান্ত পাল |
| কোষাধ্যক্ষ | : | জয়ন্ত দেবরায় |
| ভবনের নক্সা | : | আশিস কুমার গুপ্ত (বাস্তুকার) |
| ভিত্তি নক্সা | : | অসীম দে |
| সহায়তায় | : | মহিতোষ পাল, দীপঙ্কর দেব, অরুণ রায় |
| নির্মাণ নির্দেশনায় | : | আশিস কুমার গুপ্ত |
| তদারকিতে | : | চন্দন শর্মা |
| ভবন সাইনবোর্ড | : | মৃণালকান্তি রায় |

# প্রথম পর্বে বঙ্গভবন-এর নির্মাণ উপসমিতি

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস |
| সম্পাদক | : | প্রদীপ আচার্য |
| সদস্য | : | সুজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, অনন্ত দেব, মৃণালকান্তি দত্তবিশ্বাস, সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, সমীর কুমার দাস, বিনোদ বিহারী দেবনাথ, তৈমুর রাজা চৌধুরী, শান্তনু দাস, দীপক সেনগুপ্ত |
| কোষাধ্যক্ষ | : | বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য |
| নক্সা | : | অসীম দে (বাস্তকার) |
| কারিগরী সহযোগিতা | : | প্রণব কুমার দাস<br>রাহুল দাশগুপ্ত |

# সূচিপত্র

## বার্তা


- ❒ **জানকীবল্লভ পট্টনায়ক,** রাজ্যপাল, আসাম
- ❒ **সোমনাথ দাশগুপ্ত,** উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
- ❒ **তরুণ গগৈ,** মুখ্যমন্ত্রী, আসাম
- ❒ **গৌতম রায়,** মন্ত্রী, জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ, আসাম সরকার
- ❒ **প্রণতি ফুকন,** মন্ত্রী, সাংস্কৃতিক বিভাগ, আসাম সরকার
- ❒ **অজিত সিং,** মন্ত্রী, আবগারি, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ, আসাম সরকার
- ❒ **সুস্মিতা দেব,** সাংসদ, শিলচর লোকসভা কেন্দ্র
- ❒ **নীতিশ ভট্টাচার্য,** সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
- ❒ **গৌতমপ্রসাদ দত্ত,** সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
- ❒ **তৈমুর রাজা চৌধুরী,** সভাপতি, কাছাড় জেলা সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
- ❒ **দীপক সেনগুপ্ত,** সম্পাদক, কাছাড় জেলা সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন


## সম্পাদকীয়

## স্বপ্ন, দুঃস্বপ্নপর্ব


- ❒ বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা !! **সুজিৎ চৌধুরী** !! ৩১
- ❒ ভাষা সংগ্রামের চেতনা : আমাদের উত্তরাধিকার !! **ইমাদ উদ্দিন বুলবুল** !! ৩৭


## উদ্যোগপর্ব


- ❒ বঙ্গভবনের হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত !! **বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য** !! ৪৪
- ❒ বঙ্গভবন—আমার কথা !! **দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস** !! ৪৭
- ❒ বঙ্গভবন আদিপর্ব !! **প্রদীপ আচার্য** !! ৫৪
- ❒ স্বপ্ন যখন সত্যি হয়... !! **তৈমুর রাজা চৌধুরী** !! ৬১


## সৃজনপর্ব


- ❒ বঙ্গভবন নির্মাণ ও কিছুকথা !! **সুজন দত্ত** !! ৬৬
- ❒ বঙ্গভবন নির্মাণে আমার অভিজ্ঞতা !! **চন্দন শর্মা** !! ৬৮
- ❒ সম্প্রসারিত বঙ্গভবন : কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন !! **জয়ন্ত দেব রায়** !! ৭০

## অনুভব


- ❒ উনিশ, একুশ ⁞⁞ বিজয়কুমার ভট্টাচার্য ⁞⁞ ৭৩
- ❒ আমাদের সবার অহঙ্কার, আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসের স্বপ্নকল্প ফসল ⁞⁞ গৌতম রায় ⁞⁞ ৭৪
- ❒ রূপান্তরের কথা ⁞⁞ বিভাসরঞ্জন চৌধুরী ⁞⁞ ৭৫
- ❒ 'নৃতত্ত্বের উদ্যান' বরাক উপত্যকায় এ ভবন যেন হয়ে ওঠে আস্থার স্থল ⁞⁞ তুষারকান্তি নাথ ⁞⁞ ৭৭
- ❒ যেন ভুলে না যাই আমাদের সেই কাঁচা ঘরটিকে ⁞⁞ ড. সৌরীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ⁞⁞ ৭৯
- ❒ ব্যাপ্ত চিন্তা ও আদর্শের নির্যাস নিয়ে এগিয়ে চলুক ⁞⁞ পরিতোষ দে ⁞⁞ ৮১
- ❒ স্বপ্নপূরণ ⁞⁞ মোজাম্মিল আলী লস্কর ⁞⁞ ৮২
- ❒ আমার ভাবনায় বঙ্গভবন ⁞⁞ তমোজিৎ সাহা ⁞⁞ ৮৩
- ❒ আমার বঙ্গভবন ⁞⁞ শ্যামলকান্তি দেব ⁞⁞ ৮৪
- ❒ আমার অনুভবে বঙ্গভবন : কিছু প্রশ্ন ⁞⁞ চিত্রভানু ভৌমিক ⁞⁞ ৮৫
- ❒ আমার বঙ্গভবন ⁞⁞ শেখর দেবরায় ⁞⁞ ৮৬
- ❒ অস্তিত্বের ঠিকানা ⁞⁞ সুজিত দাস (ফুলু) ⁞⁞ ৮৬


## পরিশিষ্ট


- ❒ বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ⁞⁞ ৮৭
- ❒ নথিপত্র ⁞⁞ ৮৯
- ❒ চিত্র

**RAJ BHAVAN**
**GUWAHATI**

**27th October 2014**

# Message

I am happy to know that **Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan,** Cachar Zela Samiti, Silchar, Assam is publishing a Souvenir to commemorate the inauguration cermemony of Banga Bhawan auditorium at Silchar on 14th November, 2014.

I wish the publication all success.

**Janaki Ballav Patnaik**
Governor of Assam

# আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

**(সংসদের অধিনিয়ম তেরো, ১৯৮৯ এর অন্তর্গত স্থাপিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)**

**শিলচর, কাছাড়, আসাম, পিন-৭৮৮০১১**

# শুভেচ্ছাবার্তা

এ অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, যে প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে আজ থেকে চার দশক আগে ক্ষুদ্র কলবরে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ চূড়ান্ত পর্বে। ভাষা শহিদের পুণ্য ভুবনে সেই ছোট্ট গাছটি ডালপালা বিস্তার করে আজ মহীরূহ। বলতে দ্বিধা নেই, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রত্যেক সভ্য সভ্যা এই বিশাল যাত্রার সমান অংশীদার। আমি আশাবাদী যে, ভাষা কৃষ্টি ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এই 'বঙ্গভবন' একদিন শুধু বরাক উপত্যকা-ই নয়, পূর্বভারত তথা সমগ্র ভারতের ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। বঙ্গভবন-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর এই লগ্নে উষ্ণ অভিনন্দন ভাষা-সংস্কৃতিপ্রেমী প্রত্যেককে-অভিবাদন বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনকেও।

**সোমনাথ দাশগুপ্ত**
উপাচার্য
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

শিলচর
৯ নভেম্বর, ২০১৪

सत्यमेव जयते

# Tarun Gogoi

**Chief Minister, Assam**
**Guwahati**

Dispur
11/11/2014

## Message

I am happy to know that a Bhawan named Banga Bhawan constructed by **Barak Upatyaka Banga Sahitya o Sanskriti Sammelan**, Silchar is going to be inaugurated on 14th November, 2014 and a Souvenir is being published on the occasion.

The Sammelan since its inception has been promoting cultural integrity and communal harmony by organizing literary and cultural programmes, Seminars, Publication of books, research works etc. I hope the organization will continue to work in the fields of literature and culture with renewed zeal and vigour in the days ahead.

I wish grand success of the programme.

**(TARUN GOGOI)**

***Gautam Roy***
***गौतम रॉय***

**MINISTER, ASSAM**
**Public Health Engineering Dept**
**Quarter No. 92, Old MLA Hstel,**
**Dispur, Guwahati-6**
**Phone : 2237014 (O), 2260283 (R)**
**Hailakandi : 222267 (R)**

सत्यमेव जयते

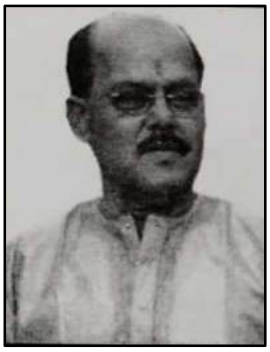



# শুভেচ্ছা

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন দীর্ঘ ৩৭ বৎসর ধরে উপত্যকায় সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আসছে। সম্মেলনের এ নিরলস প্রয়াসকে যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকেই সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য বলেই মনে করি। তাই আমি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সরিয়ে রেখে একজন সচেতন বরাকবাসী হিসাবেই এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করি। সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতি যখন একটি স্থায়ী ঠিকানার সন্ধানে তখন আমি তাঁদের এ প্রয়াসের একজন সহযাত্রী হিসেবেই এগিয়ে আসি। যখন প্রাথমিক ভাবেই একটি কাজ চালানো ভবন ওরা তৈরি করলেন এবং আরও একটু সম্প্রসারণের স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন আমি পরামর্শ দিলাম বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর, ওরা একটি পূর্ণাঙ্গ ভবন তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। আমি লক্ষ্য করছি সম্মেলনের প্রত্যেক সদস্যই নিঃস্বার্থভাবে এ বিশাল ভবন তৈরিতে এগিয়ে এসেছেন। উপত্যকার স্বপ্নের এ বঙ্গভবন আজ এখানকার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির এক প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বাঙালি সহ অপরাপর ভাষিকগোষ্ঠীর জনগণের কাছেও যাতে এ ভবন আস্থার প্রতীক হতে পারে এটাও কাম্য। এখন থেকে শিলচর আসা মানুষের কাছে বঙ্গভবন একটি দর্শনীয় তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠবে এ আমার বিশ্বাস। বরাক ব্রিজ থেকেই সবাই দেখবেন বাংলার মনীষীদের তৈলচিত্র এবং অনুভব করবেন ওরা ভাষা শহিদের ভূমিতেই প্রবেশ করেছেন।

আমি বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, এবং সবাইকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানাই।

গৌতম রায়

১৪ নভেম্বর, ২০১৪

*Smti. Pranatee Phukan*
**Minister,**
**Handloom & Textiles, Sericulture and**
**Cultural Affairs, Assam**
**Dispur, Guwahati-781 006**
Phone : 0361-2237239 (O), 2266293 (R)
e-mail : pranateephukan@rocketmail.com

सत्यमेव जयते

No. ……
Dated : 10-11-14

# Message

I am happy to know that Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan, Silchar, Cachar is going to inaugurate their newly constructed Auditorium named Banga Bhawan on 14th November, 2014 and that a Souvenir is being published on this occasion to commemorate the event. It is undoubtedly an imporanat addition in the field of cultural development.

I am also happy to know that Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan stands committed to Socio-cultural and literary development of Barak Valley through various socio-cultural and literary activities. May their endeavours make Barak Valley prosperous socially, culturally and literally.

On this occasion 1 extend my heartiest greetings to the organizers and wish the sammelan all success.

**(PRANATEE PHUKAN)**
**Minister**

# AJIT SINGH

सत्यमेव जयते

Minister of State (Ind.)
Excise and Sports &
Youth Welfare Departments,
Government of Assam
Guwahati-781006
Ph. No. : 0361-2237023(O)
0361- 2262597 (R)

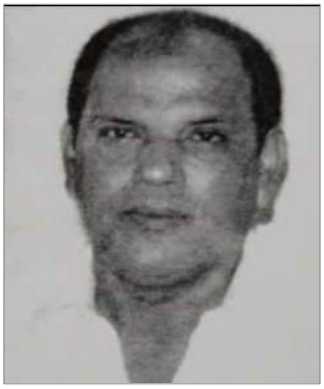

## শুভেচ্ছা

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্য দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের বাতাবরণ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আসছে। বরাকবাসী হিসেবে বিভিন্ন সময় আমি এ প্রতিষ্ঠানের সহযোগীও। সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতি যখন একটি ভবন তৈরির প্রয়াস নিয়েছেন তখন আমি খুবই উৎসাহী হয়ে উঠি। আজ যখন আমাদের শিলচর শহরের প্রবেশপথেই একটি দৃষ্টিনন্দন চিত্রশোভিত বহুতলবিশিষ্ট বঙ্গভবন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমি অতিশয় আনন্দিত। এ কাজে সহযোগীর ভূমিকায় থেকে আমি নিরতিশয় তৃপ্ত। সম্মেলনের কর্মকর্তাদের আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই অভিনন্দন জানাই।

এ ভবনকে কেন্দ্র করে উপত্যকার সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চায় যেন নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটে। বরাক উপত্যকা যেন বহুভাষিক সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে অমলিন রাখতে প্রয়াসী হয়। বঙ্গভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেন আমাদের এক নতুন ইতিহাসের জয়ধ্বনি শোনায়।

অজিত সিং

১১ নভেম্বর, ২০১৪

*Sushmita Dev,* **MP**
**Silchar LAC**
**Cachar, Assam**

সত্যমেব জয়তে

**সুস্মিতা দেব**
*সাংসদ, শিলচর লোকসভা কেন্দ্র*
**কাছাড়, আসাম**

# শুভেচ্ছা

বঙ্গভবন-এর সঙ্গে এক আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করি। প্রতিদিন পুরসভায় যাবার পথে সম্প্রসারিত বঙ্গভবন তৈরির কাজ দেখতে ভুলতাম না। তিলে তিলে হল সুদৃশ্য এই ইমারত যা এই উপত্যকার মানুষের আত্মপরিচয়ের ঠিকানা। উনবিংশ-বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ধ্বজা যারা উর্ধে তুলে বাঙালি জাতি সত্তা নির্মাণ করেছেন, তাঁদের সুদৃশ্য অবয়বে বঙ্গভবনকে যেমন মহিমান্বিত করেছে, তেমনি তাঁদের সৃষ্টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে মান্যতা দিয়ে, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সদস্য-সদস্যাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

**সুস্মিতা দেব**
সাংসদ, শিলচর লোকসভা কেন্দ্র

১১ নভেম্বর, ২০১৪

# বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

## কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি

**দূরভাষ :** ৯১-৯৪৩৫৩৭৮৬৫৭

ইমেল: bsahitya2012@gmail.com

**সভাপতি**

দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের পথ পরিক্রমায় বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কার্যাবলীতে উপত্যকাবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। সম্মেলন এ উপত্যকার মানুষের নির্ভরযোগ্য ভরসার স্থল হয়ে উঠতে পেরেছে, কারণ ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি বরাক উপত্যকার অর্থনীতির বিকাশ, উন্নয়ন, রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগের সমস্যা, বিদেশি সনাক্তকরণের নামে শান্তপ্রিয় মানুষের উপর নির্যাতন, বরাক উপত্যকায় বেকার সমস্যা— এদিকেও কেবল সচেতনতাই রাখছে না, দাবি আদায়ের জন্য প্রায়ই সম্মেলনকে পথেও নেমে আসতে হয়েছে। ইতিমধ্যে জনগণের সমর্থন নিয়ে সম্মেলন বরাক উপত্যকার জন্য একটি 'স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ'-এর দাবিও জানিয়েছে। প্রয়োজন হলে আগামীতে এ নিয়ে আরও ব্যাপক আন্দোলনের জন্যেও সম্মেলন মানসিকভাবে প্রস্তুত। সম্মেলন ইতিমধ্যেই আসাম রাজ্যভাষা আইনের সংশোধিত ধারাগুলো উপেক্ষা করে বরাক উপত্যকায় বাংলা সহ অন্যান্য ক্ষুদ্রভাষিক গোষ্ঠীর অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

এ ছাড়াও এ অঞ্চলের ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য এবং অর্থনীতি নিয়ে সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ সব গবেষণাকর্মে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এ মর্মে গঠিত ভাষা অকাদেমি ইতিমধ্যে নবপর্যায়ে মূল্যবান একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশেও যত্নবান হয়েছে।

সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির উদ্যোগে একটি স্থায়ী ভবন সম্মেলনের কাজকে আরও সুসংহত রূপ দিতে সহায়ক হবে। এ ভবনের মহাফেজখানা, যে কোনো ভাষা আন্দোলনের দলিল দস্তাবেজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ হবে। স্থায়ী পাঠাগার এবং শিল্পকলা প্রদর্শনী কক্ষ এ উপত্যকার বিদ্যাচর্চা এবং শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে। যারা এ মহান যজ্ঞে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে এসেছেন তাঁদের আমি অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সমর্থক আসাম রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গৌতম রায়কে। রাজ্যস্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী অজন্তা নেওগ, সাংসদ পঙ্কজ বরা, নাজনিন ফারুকি যে ভাবে এ মহান যজ্ঞে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন এ জন্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের জনগণ যাদের সহায়তা ছাড়া সম্মেলন এ পাও এগোতে পারতো না এদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার।

বঙ্গভবনের উদ্বোধক শ্রী গৌতম রায় এবং এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে আমি স্বাগত জানাই।

**(নীতিশ ভট্টাচার্য)**
*সভাপতি*
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি

হাইলাকান্দি
১৪ নভেম্বর, ২০১৪

# বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

**কাছাড় জেলা সমিতি**

**দূরভাষ :** ৯১-৯৪০১৫৯৪৯২৪

ইমেল: gautampdutta1958@gmail.com

**সাধারণ সম্পাদক**


একটা স্বপ্ন। তাকে সামনে রেখে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। আজ সেই স্বপ্ন সাকার হল। শিলচরে বঙ্গভবন আজ বিকশিতরূপে আত্মপ্রকাশ করল। সাহিত্যপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রেমী ও নাটকের এই শহরে মাথা তুলে দাঁড়াল সংগ্রামের প্রতীক ভবনটি। আমরা অহঙ্কার করার মত আরো একটি স্থল পেলাম।

এই উপত্যকায় বাংলাভাষা-সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশ এ ক্ষেত্রে অর্জিত অধিকারের সুরক্ষা এবং আমাদের আত্মপরিচয় তুলে ধরার সংগ্রামকে সঞ্জীবিত করে সংগঠিত রূপ দিতে ১৯৭৭ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলন তার জন্মলগ্ন থেকে উপত্যকার প্রধান জনপদগুলোতে একটা নিজস্ব ঠিকানায় দাঁড়িয়ে কর্মতৎপরতা চালানোর স্বপ্ন দেখত। সেই স্বপ্ন সফল করার প্রয়াসের সূত্র ধরে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে সংগঠনের নিজস্ব ভবন। শিলচরে সম্মেলনের কেন্দ্রভূমি 'বঙ্গভবন'-কে সম্প্রসারিত করার স্বপ্ন রূপায়ণ এক সময় কঠিন মনে হত। কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব সবসময়ই ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ডের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেন। আমরা আমাদের পাশে পেলাম মন্ত্রী গৌতম রায়কে। তিনি সম্মেলনের স্বপ্নকে পল্লবিত করলেন। এগিয়ে এলেন আরো অনেকে। সবার আন্তরিকতার স্বপ্ন আজ বাস্তব। অচিরেই এই সম্প্রসারিত বঙ্গভবন এই শহর, এই উপত্যকায় সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠবে।

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন বরাবরই এক উদার সমন্বয়ী দর্শনের কথা বলে আসছে। বাংলাভাষী মানুষের সংগ্রামকে অন্য ভাষার সংগ্রামী সত্তার সঙ্গে সমন্বয় সাধনে এই অঞ্চলে এক সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করতে প্রয়াস চালাচ্ছে সম্মেলন। শিলচরের বঙ্গভবন এই সমন্বয়ী সংস্কৃতিরও চর্চাকেন্দ্র হয়ে উঠুক।

পরিশেষে, এই ভবন নির্মাণে সম্মেলনের কাছাড় জেলা কমিটি এবং নির্মাণ কমিটির আন্তরিক প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাই।

গৌতমপ্রসাদ দত্ত

(গৌতমপ্রসাদ দত্ত)

*সাধারণ সম্পাদক*

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি

শিলচর

২৭ কাতিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৪ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

# বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কাছাড় জেলা সমিতি

'বঙ্গভবন', শিলচর-৭৮৮০০১

**দূরভাষ :** ৯১-৯৪৩৫০৭৩৩৪৪

ইমেল: choudhurytr@gmail.com

**তৈমুর রাজা চৌধুরী, সভাপতি**


অবশেষে রচিত হল এক নয়া স্বপ্নগাঁথা। বরাকের শিল্প সংস্কৃতির তৈরি হল বিশ্বস্থ আশ্রয়। যার নাম বঙ্গভবন। এ শুধু সিমেন্ট কংক্রিটের এক ইমারত নয় বরাকের লক্ষ লক্ষ বাঙালির এক আকাশ আবেগ এবং বহুকালের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অভিমানের এক নিরেট রূপ। যে হবে বরাকের বহুভাষী চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অতন্দ্রপ্রহরী।

বরাকের সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতি ও শিল্পের যথার্থ সংরক্ষণ বা তার প্রচার প্রসারে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কাছাড় জেলা সমিতির বিনিদ্র চিন্তার ফসল হিসেবেই জন্ম নিয়েছে বঙ্গভবন। প্রয়োজন, তাগিদ এবং দায়বদ্ধতা থেকে বরাকবঙ্গের প্রতিটি সদস্যের চোখ বেয়ে একটা স্বপ্নের উদ্ভব, কীভাবে তার ধাপে ধাপে উত্তরণ— সেটা আজ একটা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সেই ইতিহাসের প্রত্যেক সেনানী ধন্যবাদের দাবিদার। ধন্যবাদের দাবিদার এ অঞ্চলের ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, রাজনীতিজীবী সহ সর্বস্তরের মানুষ যারা বরাকবঙ্গের স্বপ্নকে আপন করে নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বঙ্গভবনকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শক্তি জুগিয়েছেন। এ কাজে ধন-জন-শ্রম এবং পরামর্শ যে যেমন পেরেছেন দিয়ে গেছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আজকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাশ্যবাদী আবহেও সম্মিলিত প্রয়াস যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা ঠেলে সার্থকতার কোন্ শিখর ছুতে পারে তার বিশালাকায় দৃষ্টান্ত বঙ্গভবন।

১৪ নভেম্বর খুলে যাবে স্বপ্ন-দুয়ার। উদ্বোধন হবে বঙ্গভবনের। সে স্মরণীয় মুহূর্তকে সাক্ষী করে এবং বঙ্গভবন তৈরির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস গাঁথাকে ধরে রেখে বেরোচ্ছে স্মরণিকা। এ কাজে মগ্ন থাকা বরাকবঙ্গের সদস্য সহ বহু ব্যক্তি তাদের অভিব্যক্তি এতে প্রকাশ করেছেন। অল্প সময়ে নানা কাজের ফাঁকে সঞ্জীব দেবলস্কর এ স্মরণিকাটি পরিকল্পনা ও সম্পাদনা করে দিয়েছেন। এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। স্মরণিকাটি নিঃসন্দেহে এ এক অমূল্য দলিল।

একটা স্বপ্ন তার বিকাশের পথে কীভাবে একটা সামগ্রিক উন্মাদনার ও সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিতে পারে সেটাও করিয়ে দেখিয়েছে বঙ্গভবন। তাই আশা করা যায়, এটা একটা সাময়িক স্মরণিকা হয়েও আগামীদিনের জন্য চিরস্মরণীয় এবং অনুপ্রেরণাব্যঞ্জক ইতিহাসের উপাদান যোগাবে আগামী প্রজন্মকে। ইতি—

শিলচর
১১ নভেম্বর, ২০১৪

# বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কাছাড় জেলা সমিতি

'বঙ্গভবন', শিলচর-৭৮৮০০১

**দূরভাষ :** ৯১-৯৪৩৫১৭৩২৮০

**সম্পাদক**

ইমেল: dipaksengupta65@gmail.com


অবচেতন মনে স্বপ্ন ছিল অঙ্কুরিত অবস্থায়, চেতনার ম্লান আলোতে মাটির সাথে কথা বলত, দুঃখের অশ্রুতে মাটিকে সিক্ত করত আবার মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়ত নিয়তিকে মেনে নিয়ে। কিন্তু ২০১১-র ২৬ জুন এই ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটল, স্বপ্ন মাটি থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল, জন্ম হল ঐতিহাসিক মুহূর্তের, বলা যেতে পারে 'বিগ'ব্যাং'। স্রোতস্বিনী বরাকের কলকল আওয়াজে শোনা গেল ঢেউয়ের হুঙ্কার, যেন এই উপত্যকার বঞ্চিত আশাহত মানুষের অস্তিত্বের সগর্ব ঘোষণা। ২০১১-র ২৬ জুন আসাম সরকারের নবনিযুক্ত পূর্ণমন্ত্রী গৌতম রায় ঘোষণা করেন তিনি পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবন তৈরি করতে সবরকমের সাহায্য করবেন। পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ তাতে থাকবে সংগ্রহালয়, মহাফেজখানা, চিত্র প্রদর্শনীর জায়গা এবং অবশ্যই আধুনিক মানের প্রেক্ষাগৃহ। A nation writes its autobiography in the antiquarian remains and museum preserve them for posterity. যে স্বপ্ন অঙ্কুরিত হয়েছিল ২৬ জুন সেই বীজকে মাটিতে রোপণ করা হল অর্থাৎ সম্প্রসারিত বঙ্গভবনের শিলান্যাস হল ২০১১-র ১৫ আগস্ট। ২০১৪-র শেষ বেলায় যা এক মহীরূহ হয়ে আকাশকে স্পর্শ করছে যেমন, তেমনি শেকড়ে গিয়ে এই মাটিকে আঁকড়ে ধরছে, জানান দিচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি কোনও ছিন্নমূল সংস্কৃতি নয়, বহমান সময়ের স্রোতে যতই সুনামি আসুক বিশ্বায়নের ঝড় যতই 'হুদহুদ' 'ক্যাটরিনা' 'নার্গিস' হয়ে আছড়ে পড়ুক এমন কোন শক্তি নেই যাতে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। স্থাপত্য ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে তৈরি এই সৌধ একদিন ইতিহাস হয়ে উত্তর প্রজন্মের অনুরোধে 'কথা কও কথা কও অনাদি অতীত', গল্প বলবে। এই দুর্দিনে যারা আমাদের স্বজন উত্তর প্রজন্মের কাছে তাঁরা হবেন মহানায়ক। তাঁদের গলায় পরবে মালা আর যারা কুজন তারা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন। এই প্রত্যাশা রেখেই কাজ করে গেছি-কোনও সিদ্ধান্তই একক নয় প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নির্মাণ উপসমিতি বা কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় নেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সংগঠনের বাইরে সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙিনায় থাকা মানুষদের সুপরামর্শ নেওয়া হয়েছে। আশা করব বঙ্গভবন হবে এই উপত্যকার সব ভাষিক গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের ঠিকানা এবং সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মিলনক্ষেত্র।

(দীপক সেনগুপ্ত)

*সম্পাদক*

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কাছাড় জেলা সমিতি

শিলচর

২৭ কাতিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৪ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

# সম্পাদকীয়...

সম্প্রসারিত বঙ্গভবনের স্মারক পত্রিকাটি আপনদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ ভবন প্রকৃতঅর্থেই বরাক উপত্যকার একটি ভরসার কেন্দ্র হয়ে উঠুক এটা উপত্যকার বিভিন্ন ভাষিকগোষ্ঠীরই আন্তরিক কামনা। আসাম রাজ্যের বহুভাষিক চারিত্রলক্ষণকে অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক সংহতির বাতাবরণ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে যখন এ সংগঠনটি প্রিয়নাথ দেব, মেহেরাব আলী লস্কর, দেবব্রত দত্ত, সুসিত কুমার দত্ত, প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী, জগন্নাথ রায়চৌধুরী, অনন্ত দেব, সুখরঞ্জন চন্দ এবং আরও ত্রিশজন সক্রিয় সচেতন বরাকবাসীর হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেদিন তার কার্যালয় বলতে কিছুই ছিল না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনও কক্ষে ওরা বসে সম্মেলনের নীতি নির্ধারণ করতেন, কার্যসূচি গ্রহণ করতেন। এমনি করেই অবশ্য সম্মেলন কুড়িটিরও অধিক অধিবেশন করেছেন, গ্রন্থ এবং পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন কুড়িটিরও অধিক, আর উপত্যকার ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত, সমাজ, অর্থনীতি বিষয়ক শতাধিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন, নিয়মিতভাবে প্রকাশ করেছেন গবেষণাধর্মী পত্রিকা; এক একটা বার্ষিক (পরবর্তীতে দ্বিবার্ষিক) অধিবেশনে দেশবিদেশের বিদ্বৎজনকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন, আয়োজন করেছেন সংগীতের আসর, সাহিত্য বাসর, আলোচনা সভা। একটি স্থায়ী ঠিকানার অভাবে এর অনেক অভিজ্ঞানই রক্ষিত হয়নি। বর্তমানের এ পূর্ণাঙ্গ ভবনটি এ ঘাটতি পূরণে বিশেষ সহায়তা করবে।

আজকের এ বিশেষ দিনটিতে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতাদের স্মরণ করছি। স্মরণ করছি প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল, কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য এবং অসংখ্য সংস্কৃতিপ্রেমী জনগণকে যাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়নি। বঙ্গভবনের মহাফেজখানাটিতে যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমাদের দলিল দস্তাবেজ রক্ষিত হয়, ভবনের প্রদর্শনী কক্ষ, 'দৃষ্টিনন্দন'-এ যদি নিয়মিতভাবে এখানকার শিল্পীদের চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়, ভবনের গ্রন্থাগারে যদি আমাদের উপত্যকার সব ধরনের বই সংরক্ষিত হয় তবেই ভবনের সার্থকতা। এ কাজ অবশ্যই উপত্যকার জনগণের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়।

এই ভবন উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে বরাক উপত্যকা লাভ করল একটি দর্শনীয় স্থান, যে স্থানটি নানা অর্থে এ অঞ্চলের একটি প্রতীকও বটে। ভারতবর্ষের কোন্ শহরে প্রবেশপথে রাজা রামমোহন রায়-বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ, অবনীন্দ্র-রোকেয়া, নেতাজি-নজরুল ইসলাম, মুজতবা-সত্যজিৎ রায়কে

অভ্যর্থনা করতে দেখা যাবে। ভাষাশহিদের ভূমি, শ্রীচৈতন্য-শাহজালাল-হাসন-রাধারমণ-রবীন্দ্র সম্পর্কধন্য বরাক উপত্যকায়ই এটা সম্ভব। উপত্যকাবাসী যদি এখানকার এ ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে না পারেন তবে তা হবে চরম দুর্ভাগ্য।

সুরম্য অট্টালিকার গৌরবে অবশ্য আমাদের এ কথাটিও ভুললে চলবে না, সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃজনক্ষেত্র কিন্তু সুরম্য দালান নয়, আমাদের মনোভূমি। মনোজগৎকে যদি সঙ্কুচিত রাখি, মনের ভেতর যদি হিংসা, বিদ্বেষ, জমিয়ে রাখি তবে আমাদের চিন্তা-কল্পনা-স্বপ্ন সমস্তকিছুই একটি অচলায়তনে আটকা পড়বে। আমাদের মনে রাখতে হবে লক্ষ্য থেকে উপলক্ষ্য কখনও বড় হতে পারে না।

এ স্মারক পত্রিকাটিতে যাঁরা লেখা দিয়েছেন, যাঁরা চিত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। সম্মেলনের কাছাড় জেলা সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী সততই আমাকে সহায়তা করেছেন, অনুজ তমোজিৎ সাহা আমার সঙ্গে সমানতালে কাজ করে গেছেন। উপসমিতির সব সদস্যই আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। আর শিলচর সানগ্রাফিক্স-এর কর্ণধার পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী আমাদের সমস্ত অন্যায্য দাবি পূরণ করেছেন সমস্ত ধরনের অসুবিধা স্বীকার করেই। তাঁর এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উপর এ জবরদস্তি না করলে মাত্র তিনদিনে এ পত্রিকাটি প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই হত না। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। বঙ্গভবন নির্মাণে সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা বিভিন্ন সহযোগিতা করে গেছেন যাঁদের নাম এখানে অনুল্লেখিত রয়েছে তাঁদের কাছেও আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এখানে অনিচ্ছাকৃত সমস্ত ভুলভ্রান্তির জন্য আমিই দায়ী আর সমস্ত সাফল্যের কৃতিত্ব আমাদের সবার।

পরিশেষে, বঙ্গভবন উদ্বোধনী উপলক্ষে সমাগত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

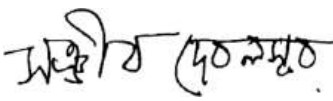

১৪ নভেম্বর, ২০১৪

সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রিয়নাথ দেব

প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি সুস্মিত কুমার দত্ত

প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী

১৯৭৭ সালে ৮ ও ৯ জানুয়ারি শিলচরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আত্মপ্রকাশ অধিবেশনের প্রধান অতিথি প্রবোধ কুমার সুনানাল

# বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা

## সুজিৎ চৌধুরী

আজকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে যে ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে আসাম নামক রাজ্যটির অবস্থান, তার প্রাথমিক আকারটি তৈরি হয়েছিল ১৮৭৪ সালে। এই সময়েই তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসাম নাম দিয়ে চিফ কমিশনার শাসিত নতুন একটি প্রদেশ গড়া হল। ব্রিটিশ সরকার মূলত চারটি স্বতন্ত্র অংশ মিলিয়ে এই প্রদেশটি গড়েছিলেন, যার মধ্যে রইল: (এক) আহোমদের রাজ্য, যা ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সীমায়িত এবং যাকে কামরূপ, দরং, শিবসাগর, লখিমপুর ও নগাঁও-এই পাঁচটি জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। নগাঁও জেলার দক্ষিণাংশ অবশ্য পূর্বতন আহোম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না-এই অঞ্চল ছিল ডিমাছা-কাছাড়ি জনজাতীয়-বংশোদ্ভব রাজাদের অধীন। (দুই) গোয়ালপাড়া জেলা, যা ছিল মোগল আমলের বাংলা সুবার অংশ, এবং ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের সূত্রে ইংরেজরা এই অঞ্চলটি অধিকার করে। (তিন) গারো পাহাড়, খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়, উত্তর কাছাড়, মিকির পাহাড়, নাগা পাহাড় প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল। পরবর্তীকালে বিজিত অন্য পার্বত্য অঞ্চলও এর সঙ্গে যুক্ত হল। (চার) শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সমভূমি, যাকে তৎকালে বলা হত সুরমা উপত্যকা, এবং এই সুরমা উপত্যকার যে অংশটি এখন ভারতের অন্তর্গত, তারই বর্তমান অভিধা 'বরাক উপত্যকা'।

ভাষিক বিচারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পাঁচটি জেলা গোড়া থেকেই অসমিয়াভাষী। যদিও এর অভ্যন্তরেও বিস্তৃত জনজাতীয় ভাষিক গোষ্ঠীসমূহ রয়েছে, আজকের বড়ো আন্দোলনের পটভূমিতে এ সম্পর্কে অনেকেই অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। গোয়ালপাড়া জেলাও আজ অসমিয়াভাষী বলে চিহ্নিত, যদিও স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এ জেলার ভাষা ছিল মুখ্যত বাংলা, প্রাচীন মোগল সুবার অঙ্গ হিসাবে অন্যরকম হওয়ার কথাও ছিল না। কোচবিহার ময়মনসিংহ সংলগ্ন ঐ জেলা কোন প্রক্রিয়ায় অসমিয়াভাষী হল, সে অপ্রিয় আলোচনায় আপাতত আমরা যাচ্ছি না। পার্বত্য যে অঞ্চলগুলি ১৮৭৪ বা তৎপরবর্তীকালে আসাম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সেগুলো সবই প্রায় এখন আলাদা আলাদা রাজ্যে সংগঠিত, শুধু ডিমাছা-ভাষী উত্তর কাছাড় জেলা এবং কার্বিভাষী কার্বি আংলং (পূর্বনাম মিকির পাহাড়) জেলা এখন পর্যন্ত আসামের মধ্যে রয়েছে, যদিও স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের আন্দোলন সেখানেও চলছে।

বাকি রইল বরাক উপত্যকা। মুখ্যত বঙ্গভাষী এই এলাকায় সর্বশেষ সেন্সাস অনুসারে বঙ্গভাষীর সংখ্যা শতকরা ৭৮। দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী হিন্দিভাষী, তাঁদের সংখ্যা শতকরা ১১। অন্যরা হচ্ছেন মণিপুরী, ডিমাছা প্রভৃতি। তার মধ্যে মণিপুরীর সংখ্যা ২ শতাংশ, ডিমাছা ০.০৯ শতাংশ। অতি অল্প সংখ্যক অসমিয়া রয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা ০.০৪ শতাংশ। বরাক উপত্যকায় বঙ্গভাষীদের এই প্রাধান্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে সংশয় রয়েছে, অনেকেরই ধারণা এ উপত্যকায় বাংলাভাষা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে তো

বটেই, এমনকি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পশ্চিমবঙ্গেও এই ধারণাটি প্রচলিত। রাজ্যটির নাম 'আসাম' হওয়ার দরুনই প্রাথমিকভাবে বিভ্রান্তি ঘটে। আমরা দেখিয়েছি যে ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ যখন 'আসাম' নামক প্রদেশটি গঠন করে তখন তাতে সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ভাষিক অঞ্চল ছিল এবং আসাম নামটা ছিল আসলে misnomer। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে স্বার্থান্বেষী মহল থেকে বরাক উপত্যকার ভাষিক চরিত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি জন্মানোর জন্য সযত্নরচিত একটা পরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই জোরদার প্রচারই এ সম্পর্কিত বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে, অথচ বরাক উপত্যকার ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক কথাগুলো জানলেই বোঝা যায় যে এখানে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল অতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, এর মধ্যে কৃত্রিম আরোপণের কোনো ব্যাপারই ছিল না।

স্বাধীনতার আগে সুরমা উপত্যকার মধ্যে উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলকে ধরা হত, এখন ঐ অঞ্চল একটি স্বতন্ত্র জেলা। যদিও সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের বিস্তর সংশ্রব রয়েছে, তবুও সাধারণভাবে আজকের বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে উত্তর কাছাড় জেলাকে ধরা হয় না। ফলে আজকের বরাক উপত্যকা বলতে দুটো অঞ্চলকে বোঝায়, সমতল কাছাড়কে নিয়ে কাছাড় জেলা। ১৯৮৯ সালে কাছাড় জেলাকে ভেঙে হাইলাকান্দি জেলা আলাদা করা হয়েছে, কিন্তু আমরা কাছাড় জেলা বলতে এখানে শিলচর-হাইলাকান্দি নিয়ে গঠিত প্রাক-বিভক্ত কাছাড়ই বোঝাব (আলোচনার সুবিধার্থে), যা ব্রিটিশ অধিকারে যাওয়ার আগে ছিল জনজাতীয় ডিমাছা রাজাদের অধীন, এবং করিমগঞ্জ জেলা, যা ছিল মূলত শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত। দেশবিভাগের সময়ে শ্রীহট্ট চলে যায় তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে, কিন্তু র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড বলে সে জেলার সাড়ে তিনটি থানা ঢোকে ভারতবর্ষে, সে থানাগুলি নিয়েই আজকের করিমগঞ্জ জেলা।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক দিয়ে কাছাড়-করিমগঞ্জ অর্থাৎ গোটা বরাক উপত্যকা যে অভিন্ন ঐতিহ্যের অধিকারী, সে কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছেন আচার্য নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে : "বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা মেঘনা উপত্যকারই (মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে, এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ববাংলার এই কয়টি জেলার, বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও পূর্ব মৈমনসিংহ জেলার সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট কাছাড় হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। শুধু তাহা নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাংলার এই জেলাগুলির সঙ্গে।"

রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক দিয়ে বরাক উপত্যকার কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা শেষ পর্যায়ে স্বতন্ত্র দুটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু তাতে মৌল সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ঐক্যের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। এ কথাটা বুঝতে হলে দুটো জেলার ইতিহাস খুব সংক্ষেপে একটু বলে নেওয়া ভালো।

এখন যে অঞ্চল নিয়ে করিমগঞ্জ জেলা গঠিত, সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রমাণ আমরা পাই খ্রিস্ট্রিয় দশম শতকে এসে। তার আগের পর্যায় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, সে ঐতিহাসিক বিতর্কে ঢুকে আমাদের লাভ নেই। দশম শতকে করিমগঞ্জ অঞ্চল ছিল বঙ্গ-হরিকেলের রাজা শ্রীচন্দ্রের রাজ্যসীমার অন্তর্গত। শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রফলক শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমভাগ গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে, ঐ ফলকটির পাঠোদ্ধার করেছেন কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী এবং দীনেশচন্দ্র সরকার। ঐ ফলকে বলা হয়েছে যে, তৎকালীন শ্রীহট্ট মণ্ডল বলে যে প্রশাসনিক বিভাগটি ছিল, তার মধ্যে চন্দ্রপুর বিষয় (বিষয়-জেলা) বলে একটি উপ-বিভাগ ছিল। আজকের করিমগঞ্জ জেলার বড়

অংশটিই ছিল ঐ চন্দ্রপুর বিষয়ের অন্তর্গত। করিমগঞ্জ জেলার প্রধান নদী কুশিয়ারার নামও ঐ লিপিতে রয়েছে 'কোসিয়ারা' নদী নামে। চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে হজরত শাহজালাল বাংলার সুলতানের সহায়তায় শ্রীহট্ট জয় করেন, তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবেই এই অঞ্চল চলে যায় বাংলার সুলতানদের অধীনে। বাংলার সুলতান হোসেন শাহ এবং তাঁর বংশধর মুহম্মদ শাহ এখানে একাধিক সমজিদ স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখনও লিপি-প্রমাণ সহ বর্তমান। মোগল আমলে শ্রীহট্ট ছিল সুবার একটি সমৃদ্ধ অংশ, আবুল ফজল ও টোডরমল উভয়েই এর উল্লেখ করেছেন। শ্রীহট্টের অঙ্গ হিসাবে করিমগঞ্জ অঞ্চল তখন বাংলা সুবারই অন্তর্গত ছিল। মোগল সম্রাট যখন বাংলার দেওয়ানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দিলেন, তখনই করিমগঞ্জও চলে যায় ব্রিটিশ অধিকারে। শ্রীহট্টের আসাম ভুক্তি যখন হল, করিমগঞ্জ তখন শ্রীহট্টের অঙ্গ হিসাবে আসামে ঢুকল বটে, কিন্তু ঐ আসামভুক্তির শর্তই ছিল যে, গোটা শ্রীহট্ট জেলাই থাকবে কলকাতা হাইকোর্ট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। অর্থাৎ বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার মানুষ যে গোটা ঐতিহাসিক যুগ জুড়েই প্রশাসনিক ভাষিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বঙ্গজ ঐতিহ্যই বহন করে চলেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অণুমাত্র অবকাশ নেই।

সমতল কাছাড় জেলার ইতিহাসের প্রাচীন পর্ব সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। সমতট বা পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা অঞ্চলের রাজা লোকনাথের একটি লিপিতে 'জয়তুঙ্গবর্ষ' বলে একটি অঞ্চলের কথা আছে, তার অন্তর্গত সুব্ বিষয় (জেলা) বিষয়ে একটি বিষ্ণু মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে ঐ তাম্রফলকে। লিপিটি সপ্তম শতকের। লোকনাথ বংশেরই অপর রাজা মরুণ্ড রায়ের একটি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়েছে শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার কালাপুর গ্রামে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করেন যে, অধুনা উত্তর কাছাড় ও কাছাড় জেলার জাটিঙ্গা উপত্যকারই প্রাচীন নাম ছিল জয়তুঙ্গবর্ষ। ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথ শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত 'যুগভেরী' পত্রিকায় একটি বড় প্রবন্ধ প্রকাশ করে এই অনুমানের স্বপক্ষে আরো কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। যাই হোক, এ অনুমান সত্য হলে খ্রিস্ট্রিয় সপ্তম শতকে কাছাড় জেলা ছিল সমতট বা পূর্ববঙ্গের রাজার অধীন। অতঃপর শ্রীহট্টের রাজা গোবিন্দকেশব দেব ও ঈশান দেবের ভাটেরা তাম্রলিপিতে আমরা পাই যে, কাছাড় জেলার কালাইন নদীর উপত্যকা ও আরো কিছু অঞ্চল ছিল তাঁদের শাসনাধীন। ঐ যুগের লিপিপ্রমাণ ঐ পর্যন্তই। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় শিলচরের অনতিদূরের ভুবন পাহাড়ের ভাস্কর্যের মধ্যে। ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর অনেকগুলি ছোটবড় মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলোর কাল নিরূপিত নয়। মোটামুটি ভাবে মূর্তিগুলিকে পালযুগের শেষ আমলের ভাস্কর্য বলে অনুমান করা হয়।

একাদশ শতকের পরের পর্যায়টা অন্ধকারাচ্ছন্ন; যথার্থ ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে কিছু নেই, এ-সময়েই কাছাড় জেলা ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে চলে যায় বলে অনুমান করা হয়। অতঃপর কোচরা এ অঞ্চল জয় করে কিছুদিন শাসন করেন। কোচদের হাত থেকেই অঞ্চলটা ডিমাছা কাছাড়িদের হাতে চলে যায় বলে ঐতিহাসিক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য অনুমান করেন। ডিমাছা কাছাড়িদের রাজধানী প্রথমে ছিল নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে, অতঃপর আহোমদের আক্রমণে পিছু হটে তাঁরা রাজধানী স্থাপন করেন বর্তমান উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার মাইবং-এ। তখন থেকে বাঙালি ও বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। আহোমরা মাইবং পর্যন্ত ধাওয়া করলে নিরাপত্তার খাতিরে ডিমাসারা তাঁদের রাজধানী নিয়ে আসেন সমতল কাছাড়ের 'খাসপুরে'। সেটা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের ঘটনা। এই ডিমাসদের হাত থেকেই রাজ্যটা ইংরেজদের দখলে আসে ১৮৩২ সালে।

মাইবং-এ রাজধানী স্থাপন করার পরই ডিমাছা রাজারা বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। বলা প্রয়োজন যে, ভৌগোলিক বঙ্গের প্রান্তিক জনজাতীয় রাজ্যগুলিতে রাজবংশ কর্তৃক বাংলা ভাষা গ্রহণ এবং রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার একটি সাধারণ লক্ষণ ছিল। আরাকান, ত্রিপুরা, কোচবিহারেও তাই ঘটেছিল। বাংলা ভাষার বিকাশে এই জনজাতীয় রাজবংশগুলির অবদানের কথা এখন পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়নি।

ডিমাছা রাজারা মাইবং-এ রাজধানী স্থাপন করেন ষোড়শ শতকে এবং ঐ সময় থেকে ডিমাছা রাজারা বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু করেন। এর আগে সম্ভবত তাঁরা ডিমাছা ভাষাই ব্যবহার করতেন, কিন্তু তার কোনো লিপিপ্রমাণ আমরা পাইনি। যাইহোক, ডিমাছা রাজাদের দ্বারা উৎকীর্ণ লিপিগুলির মধ্যে যেটিকে সর্বপ্রাচীন বলে এখন পর্যন্ত ধরা হয়, তা ১৫৭৬ সালের (শক ১৪৯৮) লিপিটি মাইবং-এ রাজনির্মিত একটি সিংহদ্বারের উপর উৎকীর্ণ। ঐ লিপির পাঠ হচ্ছে "শুভমন্ত্র শ্রীশ্রীযুক্ত মেঘনারায়ণ দেব হাচেংশা বংশ জাত হৈ সিঙ্গদ্বার বান্ধাইলেন।" এ ভাষা নিশ্চিতই বাংলা। ১৭৩০ সালে ডিমাছা রাজা সুরদর্পনারায়ণের সভাকবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি রাজমাতার অনুরোধে সংস্কৃত 'নারদীয় কথামৃত' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। বাচস্পতিকে ডিমাছা রাজ্যের সবচাইতে স্বীকৃত কবি হিসাবে ধরা হয়। বাচস্পতির অনুবাদের ভাষা নিম্নরূপ : -

অদ্যাবধি পুণ্যধারা বহিছে ভুবনে
কৃতার্থ হইতেছে লোক গঙ্গা দরশনে
পরশ করিলে পাপ যায় অতি দূরে
পর উপকারে প্রাণ দিলা গয়াসুরে।

অথবা

প্রণমহু ভূমিপতি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
বিষ্ণুর বল্লভা কামদেবের জননী
ক্ষীরদ তনয়া দেবী ভকত বৎসলা
না বুঝিয়া মূঢ় লোকে বলে তো চঞ্চলা।

একই সময় অপর একজন অজ্ঞাতনামা কবি সুরদর্পনারায়ণের আদেশেই ব্রহ্মপুরাণ অনুবাদ করেন। তাঁর ভাষা : -

অতিথ য়াসিলে জেই করায়ে ভুজন
সুদ্ধমন হৈয়া করে অতিথি সেবন
অতিথ সেবার পরে আর নাহি ধর্ম
তুমাতে বোলিল আমি এই সব মর্ম।

গ্রন্থে অন্তে তারিখ দেওয়া হয়েছে বাংলায় : "ইতিব্রহ্মপুরাণ পুস্তক সমাপ্ত। সন ১২০১ বাঙ্গলা মাহে চঃ আষাঢ়....." ইত্যাদি।

চন্দ্রমোহন বর্মণ ছিলেন জাতিতে ডিমাছা, তিনি অষ্টাদশ শতকের লোক, বাংলা দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। ভাষার নমুনা : -

হেড়ম্ব রাজার কথা জিজ্ঞাসিলা তুমি
মন দিয়া শুন কহি অপূর্ব কাহিনী

অথবা

বাচস্পতির জন্য আমি হইলাম অপমান
আমা হইতে হইল ইহার অধিক সম্মান।

শেষ দুজন ডিমাছা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র, নিজেরাই কবি ছিলেন। তাঁদের রচিত গান এককালে রাজ্য মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রচিত গানের ভাষা : -

আমি তোমার, তুমি আমার মা সর্বলোক জানে
গলায় পলিতা যেন না ছাড়ে ব্রাহ্মণে
চৌদিকে অরণ্যের মধ্যে মাগো তোমার নামটি জাগে
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তোমার চরণ মাগে।

পরবর্তী রাজা গোবিন্দচন্দ্র রচিত গান : -

আমরা গোপিনী বিরহে তাপিনী
বিদায় দিও না শ্যাম নিদয় হও না
ছাড়িয়া বন্ধুগণ লইলাম শরণ
স্নেহশূন্য বাক্য বলিও না

ডিমাছা রাজ্যে ডিমাছা-বাঙালি নির্বিশেষে সকলেরই সংস্কৃতিচর্চার ভাষা যে বাংলাই ছিল, সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ আর থাকে না।

ডিমাছা রাজভাষার সরকারি কাজকর্মের ভাষাও ছিল বাংলাই, কদাচিৎ সংস্কৃতও ব্যবহার করা হত। অন্য কোনো ভাষা নৈব নৈব চ। মেঘনারায়ণদেবের ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের প্রস্তরলিপির পাঠ আমরা আগে দিয়েছি। রাজা কর্তৃক ভূমিদানের যতগুলি দলিল এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার সবগুলির ভাষাই বাংলা। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের রাজা হরিশচন্দ্র প্রদত্ত দলিলের ভাষা: "জঙ্গল আদি আবাদ করত ভাই বাপকে বসাইবায়, তোমরা বসিবায় ও লোক বসাইবায়।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একটি দানপত্রের ভাষা: "পশ্চিমের জঙ্গলা ও বটজমিন শ্রী আত্মারাম ভট্টাচার্য্য আবাদ করিয়াছিলেন, সেই জমির বিস হাল শ্রী আত্মারাম ভট্টাচার্য্যর নিমিত্ত ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিলাম।" ১৭৯১ সালের আরেকটা দলিল পাচ্ছি: "দক্ষিণে বাঙ্গালী নদীখালের মধ্যে বসিতে দিলাম।"

ডিমাছা রাজ্যের আইন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের লেখক উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ জানাচ্ছেন : "কথিত আছে এই আইন সুরদর্প নারায়ণের সময় প্রথম লিখিত হয়।" ভাষার আলোচনা হইতে বোধ হয় যে, উক্ত আইন কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে (১৭৮০-১৮১৩) বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। সে ভাষা কিরূপ ছিল? দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : "জাতি ও গুণেতে সমান ব্যক্তিতে ক্রোধ করিয়া যদি ভস্ম ও অঙ্গারক্ষেপ করে ও কিংবা কর তাড়না করে তবে রাজাতে দুই রত্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়। ... শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্তচ্ছেদন দণ্ড জানিবা।" ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়নের প্রয়াস বোধহয় সর্বপ্রথম ডিমাছা রাজারাই করেছিলেন। সে আইন গ্রন্থ অষ্টাদশ শতকের বাংলা গদ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের কাছে তথ্যটি এখনও যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি, যদিও 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি' নাম দিয়ে এই আইন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এ শতকের প্রথম দিকেই। পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ও রায়বাহাদুর বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর এই প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

কাছাড় জেলা বা সমতল কাছাড় যখন ডিমাছাদের হাতে যায়, তখন অতি সামান্য সংখ্যক 'কোচ' বা 'ধেয়ান' বসবাস করতেন খাসপুরের আশেপাশে, আর বিস্তৃত অঞ্চলই ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। এই অঞ্চলে রাজকীয় আনুকুল্যে শ্রীহট্ট ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক এনে বসবাসের তখনই শুরু। ঢাকা থেকে আগত ব্রাহ্মণ জগন্নাথ তর্কবাচস্পতিকে ষোড়শ শতকেই জমিজমা দিয়ে বসানো হয়েছিল রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্যোগে। পূর্ববঙ্গ থেকে ব্রাহ্মণ এবং অন্য বর্ণহিন্দুকে এনে বসানোর রীতিটা পরবর্তী সমস্ত রাজাই অনুসরণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে উর্বর অথচ অনাবাদী জমিতে চাষাবাদের জন্য লোক বসানোতে রাজাদের আগ্রহ ছিল সমধিক। পূর্ববঙ্গের ভূমিহীন দরিদ্ররা সে সুযোগ নিতে আসতেন। খাসপুরে যখন রাজধানী এল, তখন দু ধরনের বসতি স্থাপনই বেড়ে গেল। এদিকে পার্বত্যভূমিতে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ডিমাছারা, একান্ত রাজার পার্শ্বচরগণ ব্যতীত, আর কেউ-ই সমতলে বসবাস করতে রাজি হলেন না। সমস্ত সমতল কাছাড় তাই মুখ্যত বাঙালিদেরই বসতি হিসাবে গড়ে উঠল ডিমাছা রাজাদেরই আমলে, তাঁদের আগ্রহে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। ইংরেজরা এসে তাই সমতল কাছাড়কে বাঙালি এলাকা হিসেবেই পেয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালে কাছাড়ের সুপারিনটেনডেন্ট বার্নস তাই লিখেছিলেন : The inhabitants of Lower Cachar are by the same authority, stated to be 50,000 consisting of small population of Cacharees, a large propartion of Musalman descendenants of Bengali immigrants and a small proportion of Hindoos (Cachar District Records; edited by Debabrata Dutta, p-44) তাই তারও আগে কাছাড় জেলার ব্রিটিশ অধিকারে যাওয়ার দুবছর পর ১৮৩৪ সালে তৎকালীন সুপারিটেনডেন্ট ফিসার লিখেছিলেন: The entire instruction in this district is to be conveyed in the Bengali Language.

তাই একথা কোনো বিতর্কের ব্যাপার নয় যে, বরাক উপত্যকায় বাংলা কেন? বাংলাই বরাক উপত্যকার আদি অকৃত্রিম এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত ও বিবর্ধিত সাধারণ ভাষা-তার যে মর্যাদার আসনটি দাবি করা হয়; সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক আমল থেকে সেই মর্যাদা সে পেয়ে আসছে।

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে বরাক উপত্যকার ভাষিক-সাংস্কৃতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ধারাবাহিক আন্দোলন প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিকাশে সম্মেলন তার দায়বদ্ধতা আরো ব্যাপকতর করে তুলবে বলে আশা করছি। উপত্যকার অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এবং পাশাপাশি বাংলা সংস্কৃতির বৃহত্তর আঙিনায় পদচারণার প্রয়াস সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে।

# ভাষা সংগ্রামের চেতনা : আমাদের উত্তরাধিকার

**ইমাদ উদ্দিন বুলবুল**

বরাক উপত্যকার গত একশো বছরের ঘটনাবলীর যদি একটি তালিকা তৈরি করা হয় তবে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিই তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করবে। (১) ১৩২২ বাংলার কার্তিক মাসের প্লাবন (২) ১৩৩৬ বাংলার মহাপ্লাবন (৩) ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ, যার ফলে বরাক উপত্যকার সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ বন্ধ হয়ে যায়। (৪) ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলন। (৫) দেশভাগের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে বরাকে শরণার্থীদের আগমন। (৬) বরাক উপত্যকায় 'আসাম বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার অবকাশ খুবই কম। অথচ এত সুদূরপ্রসারী একটি ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়ে থাকে। এমনকি চার দশক পার হওয়ার পথে, এত দীর্ঘ এক সময়সীমা পার হয়েও ওই সংগ্রামের চেতনাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে না। এইরূপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ে যে পরবর্তীকালে মানসিক দ্বিধাদ্বন্দু তা বিশ্লেষণ করলেই অনেক নতুন তত্ত্ব এবং তথ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে, তাই আজ ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আমাদের উচিত সমস্ত বিষয়ের একটা চুলচেরা বিচার করে দেখা।

১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেল স্টেশনে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর বিনা প্ররোচনায় গুলিচালনা করা হয়, এর ফলে এগারোটি তাজা প্রাণ আত্মাহুতি দিল। ওই সঙ্গে অনেক সত্যাগ্রহী আহত হলেন। যারা শহিদ হলেন, তারা বরাকের বুকে এমন একটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, যা যুগ যুগান্ত ধরে এ উপত্যকার মানুষকে উজ্জীবিত করবে।

কিন্তু একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকারকে সচেতনভাবে একটা পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ৬১ সালের পর ৭২ সালের শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে ব্যাপক গণ আন্দোলন, ৮৬ সালে সেবা সার্কুলার প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন হয়েছে, এবং প্রত্যেকবারই আন্দোলন সফল হয়েছে। তবু ৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনও শেষ নেই। তাই ৬১ সালের আন্দোলন সম্পর্কে নানাজনের নানা মত, স্মৃতি এবং দুঃসহ বেদনার অভিব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠে।

স্ববিরোধ কিংবা পরস্পর বিরোধী হওয়া কোনও বড় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হতেই পারে এবং কার্যত বরাকেও তা' হয়েছে। কিন্তু যখন আন্দোলন শেষ হয়ে যায় এবং সেই আন্দোলনের সুফল পরবর্তী প্রজন্মগুলি ভোগ করতে শুরু করে তখন ওই আন্দোলনের যথার্থ মূল্যায়ন শুরু হয়। সেই কারণেই ভাষা আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

শুরু হয়েছে। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা সেদিন অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা আজ নতুন প্রজন্মের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ঐতিহাসিক মূল্যায়নে তাঁদের ভূমিকা তুলে ধরছেন।

ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করতে হলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়েই প্রথমে পর্যালোচনা করতে হবে। আর ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়েই সংগ্রামের চেতনা, প্রাসঙ্গিকতা, উত্তরাধিকার সবকিছুই চোখের সামনে ভেসে উঠবে। নতুন প্রজন্মের কাছে উদ্ভাসিত হবে। কিন্তু এ সব মূল্যবান দিক নির্দেশনা করার প্রাক্কালে কবি দিলীপকান্তি লস্করের কবিতাটি তুলে ধরা প্রয়োজন—

"আমি কোত্থেকে এসেছি, তার জবাবে
যখন বল্লাম :
করিমগঞ্জ, আসাম;
তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে বল্লেন :
বাঃ, বেশ সুন্দর
বাংলা বলছেন তো।
একজন শিক্ষিত তথা সাহিত্যিকের
যখন এই ধারণা, তখন
আমি আর কি বলতে পারি,
ওঁকে ঠিক জায়গাটা ধরিয়ে দিতে
গিয়ে বল্লাম :
বাংলা ভাষার তেরো শহিদের ভূমিতে
আমার বাস।
তখন তিনি এক্কেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমাকে ভির্মি খাইয়ে দিয়ে বল্লেন—
ও। বাংলাদেশ? তা-ই বলুন।"

এই কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের মর্মবেদনার আংশিক প্রকাশ ঘটেছে। আমরা ভাষার জন্য বারবার প্রাণ দিলাম, তবু আমাদের কোনও পরিচিতি নেই। আমরা বারবার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির কোনও নির্দিষ্ট ভূমিতে না দাঁড়িয়ে যেন সবসময় একটা 'নো ম্যান্স ল্যান্ডে' দাঁড়িয়ে থাকি। আমাদের মর্মবেদনা আরও বাড়তে থাকে। তাই কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী তাঁর 'উদ্বাস্তুর ডায়েরি' কবিতার নান্দনিক চাতুর্যে আমাদের উদ্বাস্তু মানসিকতা তুলে ধরে একটা আত্মপ্রবোধ দেওয়ার অপূর্ব চেষ্টা করেছেন—

"যে কেড়েছে বাস্তুভিটে,
সে-ই কেড়েছে ভয়,
আকাশ জুড়ে লেখা আমার
আত্মপরিচয়।
হিংসা জয়ী যুদ্ধে যাব
আর হবে না ভুল

মেখলা পরা বোন দিয়েছে
একখানা তাম্বুল।
এবার আমি পাঠ নিয়েছি
আর কিছুতে নয়,
ভাষাবিহীন ভালবাসার
বিশ্ববিদ্যালয়।”

নিজেকে নানাভাবে ছয় পরিচয়ে, অহমিকায়, অভিনয়ে পরিচয় দেবার পালা, সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতার কবে যে শুরু হয়েছিল, তা আজও সমান তালে চলছে। পারস্পরিক দোষারোপ করছি ঠিকই, কিন্তু সেই গড্ডলিকা প্রবাহ হতে বের হওয়ার চেষ্টা করছি না। কারো কারো মতে এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে মাত্র।

(২)

অথচ ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন আমাদের আন্দোলনের গৌরবময় দিক সবার চোখের সামনে নতুন করে ভেসে উঠবে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সাফল্য ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, তা শুধু এ উপত্যকার জন্য নয় বরং তা স্থান কাল পাত্র অতিক্রম করে একটি চিরন্তন প্রেরণার বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে।

১৯ মে গুলিচালনায় দশ জন শহিদের লাশ শিলচর সিভিল হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। (একজন শহিদের লাশ পরদিন স্টেশনের নিকটবর্তী পুকুরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, তাই প্রথম দিন হাসপাতালে দশজনের লাশ ছিল।) এই শহিদের লাশগুলো শুম্ করার জন্য সরকারি তরফে খুবই চেষ্টা করা হয়, কিন্তু শিলচরের সত্যাগ্রহীদের তৎপরতায় সরকার পক্ষ একটি লাশও শুম্ করতে সক্ষম হয়নি। কীভাবে সরকারের পুলিশ বাহিনীর সন্ধানী চোখগুলো থেকে শহিদের লাশগুলো আড়াল করে রাখা সম্ভব হয়, তা এক দীর্ঘ ইতিহাস।

এই একটি অসামান্য ঘটনা থেকেই সেদিনের সর্বব্যাপী আন্দোলনের একটি রূপরেখা আন্দাজ করা যায়। অথচ ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকার রাজপথে পাকিস্তানি বাহিনী যাদের গুলি করে হত্যা করেছিল, তাদের অনেকেরই লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক কোনও বিষয়ের উপর বর্তমান নিবন্ধকারের এই লেখনি যাতে কোনও মনগড়া তথ্য অথবা কল্পনাবিলাস না হয়, সেজন্য ৫২ সালের বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বশীর আল হেলাল সম্পাদিত ‘ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’ (প্রকাশক— বাংলা একাডেমি ঢাকা) থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল—

‘আলি আহাদ লিখেছেন— ... পুলিশের গুলি শুরু হয় আনুমানিক তিন ঘটিকার পর। নিহত হন আবুল বরকত, সালাহ উদ্দীন, জব্বার, শফিউর রহমান ও নাম না জানা আরও কয়েকজন। ছাত্র হত্যার খবর দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে। ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অফিস, আদালত এবং যান বাহন ধর্মঘটে নামিয়া আসে।’

২১ শে ফেব্রুয়ারির গুলিচালনার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সকল বিবরণ নথিভুক্ত করার পর ওই গ্রন্থের সম্পাদক আল হেলাল সাহেব লিখছেন—

‘২১ শে ফেব্রুয়ারি ঠিক কতজন মারা যান, তা জানার আজ আর উপায় নেই। পুলিশ অবশ্যই লাশ সরিয়েছিল। এই দিন কে কে শহিদ হন, তাই নিয়েও মতান্তর রয়েছে। সালাহ উদ্দিনের নাম সবাই বলেননি। কে প্রথাম শহিদ হন, তাও বলা সহজ নয়।’ (ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পৃঃ ৩২১)

এই একটি ঘটনার তুলনামুলক বিচারে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে ৬১ সালের বরাকের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব কত সংগঠিত ছিল। আসাম সরকারের পুলিশ একজন শহিদের লাশও সরিয়ে ফেলতে অথবা শুম্ করতে পারেনি। অথচ বাংলাদেশের ২১ ফেব্রুয়ারি কতজন শহিদ হয়েছিলেন, তা সঠিকভাবে বলার উপায় সেদিনও ছিল না, আজ তো আর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কোন সম্ভাবনাই নেই।

কিন্তু বরাকের মানুষের দুর্ভাগ্য হল যে এত গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আজও প্রকাশিত হল না। এজন্য আমাদের সীমাহীন আলস্যই মূলত দায়ী। সত্যিকারের ইতিহাস প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই যে বিবেকের কাছে দোষী, সেই সত্যটুকু বোঝার পরেও খুব কম লোকই নড়েচড়ে বসছেন। 'বহু পুতে বাপ নির্বংশ' হওয়ার মত ঘটনাই ঘটে চলেছে ভাষা আন্দোলনের সঠিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

(৩)

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এতদিন কেন যে লেখা হল না, তা নতুন প্রজন্মের মনে বিরাট একটি প্রশ্ন। ইতিহাস যা আছে, তা মৌখিক ইতিহাস। মৌখিক ইতিহাসের নানা বিভ্রান্তি থাকে। সেই বিভ্রান্তি থেকে ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকারকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলকে নিতে হবে।

ভাষা আন্দোলন ১৯৬১ ছাড়াও ১৯৭২ এবং ১৯৮৬তেও হয়েছে। কিন্তু ভরাকে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি অথবা ইতিহাস বলতে প্রথমেই সেই ঐতিহাসিক ৬১ ভাষা আন্দোলনের দিকেই সবার মন ছুটে যায়। ওই ভাষা আন্দোলনে এমন এক ইতিহাস লুক্কায়িত আছে, যা সত্যিকার অর্থে তুলে ধরতে পারলে আমাদের সঠিক উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হবে। এজন্য আমাদের প্রজ্ঞার সঙ্গে গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে।

বরাকের ইতিহাসে ১৯ মে যেমন সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিন, তেমনি ১৯ জুন '৬১ সবচেয়ে শোকাবহ দিন। সেই ১৯ জুনের হাইলাকান্দি দাঙ্গার কুৎসিত এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক স্মৃতিকে ভুলতে গিয়ে প্রায় চার দশক পার হতে চলেছে, কিন্তু এখনও সেই দুঃসহ স্মৃতি আমাদেরে তাড়া করে। ১৯ জুন বাংলাভাষার বুকে ছুরিকাঘাত যারা করেছিল, পরবর্তীতে তারা তাদের ঐতিহাসিক ভুল বুঝতে পেরেছে। সেই সময়ের অনেক লোকই পরবর্তীতে '৭২ এবং '৮৬ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমরাও মনের জোরে ১৯ জুনকে অতিক্রম করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে আবুল হোসেন মজুমদার তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন— 'বিভেদের রাজনীতিই ১৯৬১ সালের এই দাঙ্গার হোতা। এর ক্রীড়ানক যারা হয়েছিলেন, আজ তারা বাতিল। যাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করেছিলেন, তাদের এক কানাকড়ি লাভ তারা করেননি। বরং ক্ষতিই করেছেন সমূহ। যে ভাষার নামে তারা এটা করেছিলেন, সে ভাষাও কিছু পায়নি। ১৯৮৯ সালে দেখেছি, অসম সাহিত্য সভার হাইলাকান্দি অধিবেশনের সময় সরকারি চাপটাই ছিল এর তথাকথিত সাফল্যের কারণ। সঠিকভাবে জনসাধারণ এর প্রতি নীরব প্রত্যাখান নীতিই গ্রহণ করেছে। নতুন প্রজন্ম যথেষ্ট অগ্রসর এবং সচেতন। তারাও নানা কারণে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তারা চায় বাঙালি পরিচয় নিয়েই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা লাভ করতে।' (সূত্র: সাপ্তাহিক পরখ, শিলচর ৩০ মে '৯৫)

(৪)

ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার কোন পথে? এই প্রশ্ন করা হলে নানা জনের নানা মত পাওয়া যাবে। যেহেতু আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা হয়নি, তাই আন্দোলনের কথা নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছায়নি। '৬১ সালে যে শিশুর জন্ম হয়েছিল আজ তার বয়স হবে ৩৬ বছর। একেবারে ভরপুর যৌবন। অথচ ভাষা আন্দোলনের কাহিনি আজ তার কাছে কল্পকথার সামিল। সামাজিক প্রেক্ষাপট তার কাছে অস্পষ্ট। শহিদ স্মৃতির ফলকগুলো দেখে তারও মনে স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে বিষয়টি ভালো করে জানার। কিন্তু কে তাকে সবকিছু খুলে বলবে? মৌখিক ইতিহাসের মধ্যে তথ্য বিকৃতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে যে উত্তরাধিকার সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। লিখিত ইতিহাস প্রকাশিত হলে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরাধিকার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অথচ মানুষের জানার কী আগ্রহ। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত মৌলিক রচনা কোনও কিছু যে কোনও পত্রিকায় বের হলেই জানাজানি হয়ে যায়। মানুষ অনেক খোঁজখবর নিয়েও তা গড়ে।

ভাষা আন্দোলনের প্রধান উত্তরাধিকার হল সেই ভাষাকে প্রাণের ভাষা হিসেবে আঁকড়ে থাকা। ইংরাজি মাধ্যম প্রাথমিক স্তর থেকে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটছে, তা নিশ্চিতভাবে আন্দোলনের সুস্থ উত্তরাধিকারের পরিপন্থী। শিশুকে ইংরাজি মাধ্যমে পড়ানো একটা ভ্রান্তিবিলাস, এ সম্পর্কে মানুষ ক্রমেই সচেতন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি করে হবে। মাতৃভাষা বাংলাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের একটি সঠিক ও স্থায়ী উত্তরাধিকার সৃষ্টি হবে। এই বিষয়টি একদিনে হবার নয়। বিশেষত ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে অনেক অনেক বছর লাগবে। তবে কিছু লোকও যদি এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেন, তবে একদিন সেই উদ্দেশ্যও সফল হবে।

পশ্চিমবঙ্গের একজন মনীষী একবার বলেছিলেন— 'যারা বলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়ানো যায় না, তারা হয়তো বাংলা ভাষা জানেন না, নতুবা বিজ্ঞান বুঝেন না।' এই ধরনের আত্মপ্রত্যয়ই হোক আমাদের ভবিষ্যৎ পাথেয়।

(৫)

ভাষা আন্দোলনের আরও একটি সুদূরপ্রসারী উত্তরাধিকার হবে নিজেদের বাঙালি সত্তা সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। আমরা যে বাঙালি, এই বোধটুকু সর্বব্যাপী করে তোলা। বাঙালি একটি আত্মপরিচয়ের সত্তা হিসেবে কত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, তা কেউ বলতে পারে না। আবহমানকাল থেকেই এই সত্তা বিরাজমান।

বঙ্গের সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত, তাই বাঙাল অথবা বাঙালি। অন্যান্য জাতীয় সত্তা যেভাবে মূলত একটি ভৌগোলিক পরিচয় থেকে শুরু হয়, বাঙালিও (অথবা বাঙাল) সেইরকম একটি ভৌগোলিক পরিচয় থেকে শুরু হয়েছে। বঙ্গে যারাই প্রব্রজন করে এসেছেন, তারাও কালক্রমে বাঙালি হয়ে গেছেন। কনৌজের ব্রাহ্মণ কিংবা আফগানিস্তান সহ অনান্য পার্শ্ববর্তী দেশের 'খান' সৈয়দ ও অন্যান্য বংশস্রোতের লোকও বাংলার আলো হাওয়া রৌদ্রের স্পর্শে ক্রমেই বাঙালি হয়ে গেছেন। অন্য কোনও পরিচয় কিংবা সত্তা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। বাংলার প্রকৃতি তাদেরকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালি (কিংবা বাঙাল) রূপে গড়ে দিয়েছে। 'বাঙালি' এবং 'বাঙালের' ব্যাকরণগত পার্থক্য উপলব্ধি করার সাধ্য এই নিবন্ধকারের একেবারেই নেই।

হাজার হাজার বছরের বাঙালি সত্তা ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ, বর্ণবাদ, ধর্মান্তকরণ, আঞ্চলিক ইত্যাদির চোরাবালিতে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, এই তত্ত্বটি স্বীকার করে নিয়েও প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে বাঙালি সত্ত্বার ঐতিহাসিক জয়যাত্রা কিন্তু থেমে যায়নি। ক্রমাগত সামনের দিকেই এগিয়ে চলেছে এবং আজকের এই চলমান দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা আন্তর্জাতিকতার স্তরে গিয়েও তার মৌলিক সত্তা হারায়নি, বরং জোরদার হয়েছে।

এই বাঙালি সত্তা সম্পর্কে ড॰ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এমন একটি সত্যি কথা বলেছিলেন, যার অনুরণন ছিল সুদূরপ্রসারী। ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসে সভাপতির ভাষণে এক স্থানে বলেছিলেন-'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমার বাঙালি। এটা কোন আদর্শের কথা নয়, এটা একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।' (সূত্রঃ বশীর আল, হেলাল সম্পাদিত 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' পৃঃ-৫৮৭)

ড॰ শহীদুল্লাহর সেই ঐতিহাসিক উক্তি নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 'আজাদ' সহ অন্যান্য পত্র পত্রিকায় জোর বাদপ্রতিবাদ ও বিতর্ক হয়েছিল। পণ্ডিতপ্রবর ড॰ শহীদুল্লাহর ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক বিশাল রচনার মধ্যে অনেক স্ববিরোধ থাকলেও এই খাঁটি একটি সত্য কথায় কোনরূপ স্ববিরোধ ছিল না। অত্যন্ত সহজ সরল একটি বক্তব্য, যা থেকে ওই সময়ের বিদ্বৎ সমাজে এ কথাই প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে যার সারমর্ম হচ্ছে বাঙালিত্বের সঙ্গে অন্য যা কিছুর মতাদর্শগত সংঘর্ষ হবে, পরিণামে বাকি সব কিছুই পরাজিত হবে, জয় হবে বাঙালিত্বের অর্থাৎ বাঙালি সত্ত্বার। ওই ঐতিহাসিক উক্তিতে 'মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে' এখানে 'মা প্রকৃতি' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ আবহমানকালের বাঙালি মননের পরিচয় বহন করছে। তিনি সমগ্র সত্তা ও মননে বাঙালি হয়েই এরূপ উক্তি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রবহমান সাংস্কৃতিক স্রোতই আজ প্রমাণ করছে যে ড॰ শহীদুল্লাহ এ ব্যাপারে দারুণ সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। তবু মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি আসে। আর সেই বিভ্রান্তিকে দূর করার জন্য ঢাকার বাংলা একাডেমির প্রকাশিত অনেক গ্রন্থের শুরুতে লেখা থাকে— 'একুশ আমাদের পরিচয়'। বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার এ এক দৃপ্ত ঘোষণা, সচেতন প্রয়াস।

(৬)

নিজের আত্মপরিচয় নিয়ে নানাজনের মনে নানাভাবে প্রশ্ন আসে। পরিচয়ের প্রশ্ন কবি শঙ্খ ঘোষকেও নানা সমস্যার সম্মুখীন করে তোলে— তাই তিনি তাঁর কবিতায় জিজ্ঞাসা করেন—

'কি আমার পরিচয় মা?'

বরাক উপত্যকায় এই সত্তার দ্বন্দ্ব আমাদের অগ্রগতির রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। নিজের ভিতরে সত্তার দ্বান্দ্বিক আঘাতে নিজেদের 'সত্তাহীন' বলে ঘোষণা করা যায় কি না, তা' নিয়েও হয়তো অনেকে মনে মনে ভেবেছেন। কিন্তু বাস্তবে নিজেদের সত্তাহীন বলে ঘোষণা কার সম্ভব নয় বুঝেই নানা সত্তার তুলনামূলক বিচারে মধ্যরাত্রি অবধি তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যান অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে আধা যোগী-আধা গেরস্থরা। এ ধরনের সংশয়গ্রস্ত লোকের কাছে সত্তার সঠিক পরিচয় ধরা পড়ে না। শতাব্দী কেটে যায় কী নিদারুণ ভ্রান্তিবিলাসে।

তবুও আমরা ঘুরে ফিরে চলে আসি ভাষা সংগ্রামের উত্তরাধিকারের বিতর্কে। আর এই মানসিক দ্বন্দু দূর করার জন্যই বরাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা খুব বেশি করেই অনুভূত হচ্ছে। আজ অনেকেই বলতে শুরু করেছেন-'আমাদের অমুক ব্যাপারে যে আন্দোলন করা প্রয়োজন, তা ভাষা আন্দোলনের মতই সর্বব্যাপী হবে। এবারের অমুক ব্যাপারে গণ জাগরণ আমাদেরকে ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।' এই যে অমুক ব্যাপারে তমুক উদ্দেশ্যে ভাষা আন্দোলনের উদাহরণ দেওয়ার মধ্য দিয়েই ভাষা

আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা কিন্তু সবার নজরে চলে আসছে। তবে যে কোনও ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন জড়িত। যাঁরা ভাষা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা কেবল ভাষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয়, বরং ওই সঙ্গে তাঁদের সার্বিক অস্তিত্ব ও সত্ত্বা টিকিয়ে রাখার জন্যই ওই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন করেছিলেন। ভাষিক চেতনার সঙ্গে আমাদের সত্তার চেতনা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও উত্তরাধিকার নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব বেশি চিন্তাচর্চা এখনও শুরু হয়নি। তবে এই চেতনাকে যথাযথ লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বরাক উপত্যকার কয়েকজন লেখক এবং কিছু সংস্থা যে আন্তরিক প্রয়াস শুরু করেছেন, সেই সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধকারের 'ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রভাব' নিবন্ধে (যা দৈনিক যুগশঙ্খে ৭, ৮ এবং ৯ অক্টোবর '৯৬ তারিখে তিন কিস্তিতে প্রকাশিত) সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। আবার তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। পরিশেষে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে ধর্মীয় কিংবা অন্য যে কোনও মানসিক দ্বন্দু থেকে মুক্ত হয়ে চেতনার গভীর স্তরে নিজেদের বাঙালি সত্তাকে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়েই ভাষা আন্দোলনের সত্যিকারের উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হবে। বারে বারে আমাদেরে ভাষা আন্দোলনের চেতনার কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেদিন সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র তার সকল শক্তি নিয়ে লড়েও ভাষা সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। এক অস্বাভাবিক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লড়েও মাতৃভাষার অধিকার অর্জন করতে উপত্যকাবাসী সক্ষম হয়েছিল, এই জয় প্রসূত আত্মবিশ্বাসই হোক আমাদের ভবিষ্যৎ চলার পাথেয়। আর শহিদ স্মৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী অমর হোক।

# আলোর পথযাত্রী

সাবেক বঙ্গভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে অনন্ত দেব

কচিকাঁচাদের সঙ্গে সম্মেলনের প্রাণপুরুষ প্রসূনকান্তি দেব

সাবেক বঙ্গভবনে অনুরূপা বিশ্বাস, প্রসূনকান্তি দেব, সুধীর কর এবং সুজিৎকুমার ভট্টাচার্য

বঙ্গভবনে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

# বঙ্গভবনের হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

## বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। জন্মলগ্ন ১৯৭৭ থেকে দীর্ঘদিন সম্মেলনের ঠিকানা থাকত প্রযত্নে সাধারণ সম্পাদকের ব্যক্তিগত আবাসস্থল। লেখক, শিল্পী, কবি এবং সংস্কৃতমনস্ক বাক্তিরা দীর্ঘদিন শিলচরের নরসিং হাইস্কুল, পাবলিক স্কুল, ডি.এন.এন.কে স্কুল বা গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থানে অস্থায়ীভাবে কার্যালয় করে কাজকর্ম করেছেন, সম্মেলনের অনেক অধিবেশন সুসম্পন্ন করেছেন। সম্মেলনের স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণে একটুকরো জায়গার জন্য ব্যক্তিবর্গরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৪ সালে সম্মেলনের তদানীন্তন সভাপতি নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক বিজিৎ চৌধুরীর উদ্যোগে চাঁদমারিতে দূরদর্শন কেন্দ্রের নিকট মূল সড়কে ৪ (চার) কাঠার উপর একখণ্ড জমি মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার বদান্যতায় সম্মেলন লাভ করে। কিন্তু নানা কারণে ওই জমিতে দীর্ঘসূত্রিতায় স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণ করা সম্ভব পর হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে ওই জমিতে ২০১২ সালে মাননীয় সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থের সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের আড়াই লক্ষ টাকার চার সীমানার দেওয়াল নির্মাণ সহ গেট দিয়ে সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির জায়গাটি সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সংস্থা 'কৃষ্টি বিবেকের' পাশের জমিটি আজও ওই অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। যাতায়াতের সুবিধা ও সহজে যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে কাছাড় জেলা সমিতির নিজস্ব একখণ্ড জমির সন্ধান চলতে থাকে। ২০০৩ সালে শিলচর অধিবেশনের সময় কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান সরকারি আধিকারিক দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস উৎসাহ নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরই উদ্যোগে শিলচর কোর্ট প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে পুরসভার জমির পাশে ফরেস্ট অফিসের পূর্বদিকে সরকারি খাস জমির সন্ধান পাওয়া যায়। আসলে প্রাক্তন জেলা অতিরিক্ত উপায়ুক্ত দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস এক সময় জেলার সেটেলমেন্ট অফিসারও ছিলেন। তাই তাঁর কাছে জায়গা জমির ব্যাপার-স্যাপার খুব সহজবোধ্য ছিল। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং আসামের মন্ত্রী গৌতম রায়ের উদ্যোগে প্রথম দফার বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন সরকারি পরিত্যক্ত ডোবাখানায় পাঁচ কাঠার জমির বন্দোবস্ত পায়। একই সঙ্গে শিলচর ব্রিজ ক্লাবকে মাননীয় মন্ত্রী আড়াই কাঠা জমি বন্দোবস্ত দেন। এখানে উল্লেখ্য যে মন্ত্রী গৌতম রায়

ওই সময় আসামের ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রীর দায়িত্বেও ছিলেন। এর আগে জমির আবেদন নিয়ে তৈমুর রাজা চৌধুরী, সৌরীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, অনন্ত দেব, প্রদীপ আচার্য, বিনোদ দেবনাথ, দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের তারাপুর বাড়িতে দেখা করেন। সকালে সাক্ষাতের জন্য সময় চাওয়ার সময় বিস্তারিতভাবে কেন্দ্রীয় সদস্য বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সন্তোষমোহন দেবকে জানিয়েছিলেন। কথামত কাজ হয়। শ্রী দেব বঙ্গসাহিত্যকে একখণ্ড জমি বরাদ্দের ব্যাপারে তদানীন্তন জেলা উপায়ুক্তের ল্যান্ড এডভাইসরি কমিটিতে সুপারিশ পাঠান। তখন জেলাশাসক ছিলেন প্রদীপ কুমার দাস। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনকে পাঁচ কাঠা জমি সরকারি তরফে বরাদ্দের পর প্রচার মাধ্যমে গৌহাটি থেকে সংবাদ প্রচারিত হয় ১ (এক) বিঘা জমি সম্মেলনকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। আসলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পাঁচ কাঠায় এক বিঘা হয়। স্বাভাবিকভাবেই গৌহাটির সব সংবাদদাতাই এক বিঘা জমি দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করেন। এর পরপরই আমরা সদলবলে মন্ত্রী গৌতম রায়ের মেহেরপুর বাড়িতে ধন্যবাদ জানানোর জন্য দেখা করতে যাই। প্রসঙ্গক্রমে এক বিঘা জমির কথাটাও আলোচনায় আসে। সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন জেলা সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস ও প্রদীপ আচার্য সহ আমরা মন্ত্রীকে অতিরিক্ত পাঁচ কাঠা জমি বরাদ্দের অনুরোধ জানালে মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে অতিরিক্ত চার কাঠা অর্থাৎ সর্বমোট নয় কাঠার জমির মালিকানা বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির কাছে আসাম সরকারের পক্ষ থেকে সমঝে দেওয়া হয়।

জমি অধিগ্রহণের পর বিড়ম্বনার শেষ ছিল না। একে তো ডোবাখানায় ঘর কীভাবে হবে তা নিয়েই আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম, অন্যদিকে পুরসভার রাস্তার সম্মুখ থেকে কোর্ট প্রাঙ্গণ যাওয়ার সেই পুরানো রাস্তার পরিধি ছিল তিন ফুট। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অনন্ত দেব মহাশয় বরাবরই জেলা সমিতির নিজস্ব ভবনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁরই আন্তরিকতায় চতুর্দশ শিলচর সম্মেলনে বেশ কিছু টাকা (১ লক্ষ ২৪ হাজার সুদ সহ) কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। তিনি সম্মেলনের সঞ্চিত টাকা ফিক্সড্ ডিপোজিট করে রেখেছিলেন। এর পরেও সপ্তদশ অধিবেশনের কিছু টাকা (৫১ হাজার) সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত কুমার ভট্টাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর কাছে ছিল। আমাদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করার জন্য মূলধন বলতে ওই টাকাই তখন সম্বল।

এরপর সম্মেলনের কর্মকর্তারা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায় থেকে ৬ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার আশ্বাস পাওয়ার পরই বঙ্গভবনের শিলন্যাসের দিন স্থির করা হয়— ৭ ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রিঃ (২১ অগ্রহায়ণ ১৪১২ বাংলা)। ওই দিন কাছাড় জেলা সমিতির কার্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় ভারীশিল্পমন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব ও প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন ভূমি, রাজস্ব ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী গৌতম রায়। ওই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিমলাংশু রায়, পৌর সভানেত্রী শ্রীমতী বীথিকা দেব, জেলা সমিতির সম্পাদক প্রদীপ আচার্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সমিতির সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস। অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। শিলান্যাসের আগে বঙ্গভবনের অ্যাপ্রোচ রোড ৩ ফুট থেকে ১২ ফুট এক সকালে ধুম ধাড়াক্কাভাবে হয়ে গেল। সম্মেলনের কর্মকর্তা তৈমুর রাজা চৌধুরী জেলা উপায়ুক্ত সুনন্দা সেনগুপ্তকে অনুরোধ করে জেলা সহকারি ভূমি অভিবাসন আধিকারিক নির্মল দেবনাথকে দিয়ে পাশের জেলা উপায়ুক্তের চতুর্থ শ্রেণির কোয়ার্টারের জমি কিছুটা ছেড়ে রাস্তা চলাচলে সুবিধা করে দেন। বর্তমানে ওইখানে একটি সরকারি অফিসও তৈরি হয়েছে, এতে পূর্বসূরিদের দূরদর্শিতার ছাপ স্পষ্ট।

বঙ্গভবন নির্মাণে প্রথম পর্বে যারা আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন তাদের তালিকা দেওয়া হল—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | সন্তোষমোহন দেব, সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী- | ৫,০০,০০০/- |
| ২। | গৌতম রায়, মাননীয় মন্ত্রী, আসাম- | ৬,০০,০০০/- |
| ৩। | সুস্মিতা দেব, সভানেত্রী আঁশিয়া- | ৫,০১, ০০০/- |
| ৪। | কুতুব আহমেদ মজুমদার, বিধায়ক, সোনাই- | ২৫,০০০/- |
| ৫। | তৈমুর রাজা চৌধুরী- | ৫০০/- |
| ৬। | হেমলতা ইন্ড্রাস্ট্রিজ শিলচর- | ২,০০০/- |

ইতিমধ্যে জেলা সমিতির উদ্যোগে ‘কাছাড় জেলা ভবন নির্মাণ কমিটি’ নামে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়। দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস পদাধিকারে সভাপতি এবং প্রদীপ আচার্য সম্পাদক মনোনীত করা হয়। উপসমিতিতে সদস্যরা ছিলেন অনন্ত দেব, মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস, তৈমুর রাজা চৌধুরী, সমীর কুমার দাস, শান্তনু দাস, সুজিত কুমার ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে আরো চারজন সদস্য অর্ন্তভুক্ত হন। এরা হলেন সমীর দাস, শ্যামলকান্তি দেব, বিনোদ দেবনাথ ও প্রণব কুমার দাস । বঙ্গভবনের শিলান্যাসের পর-পরই শান্তনু দাসকে দায়িত্ব দিয়ে বঙ্গভবনের নির্মাণের কাজ শুরু করা হল। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক কাজকর্মে শ্রীদাস ব্যস্ত থাকার দরুণ পরবর্তীতে প্রদীপ আচার্য ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে আহ্বায়ক করে নির্মাণ উপসমিতিকে বঙ্গভবনের কাজকর্মের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে সময়ে বঙ্গভবনের কাজে শিলচর পলিটেকনিকের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রণব কুমার দাস সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের কাজে সহায়তা করেছেন। এছাড়া এনআইটির অধ্যাপক অসীম দে, শিলচর উন্নয়ন সংস্থার রাহুল দাশগুপ্ত পরামর্শ দেন। ইলেকট্রিক্যাল কাজে রন্টু বাঙ্গি, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট শিবব্রত দত্ত সহায়তায় ছিলেন। অসীম দে মূল কাজের প্ল্যান এস্টিমেট ও ভূমি পরীক্ষার দায়িত্বও পালন করেন। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রবীণ সদস্য অনন্ত দেব, প্রসূনকান্তি দেব এবং অনুরূপা বিশ্বাসের প্রেরণা নির্মাণ সমিতির কাজে উৎসাহিত করেছে। শিলচর উন্নয়ন সংস্থার তদানীন্তন চেয়ারম্যান পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী বঙ্গভবনের কাজে অফিস ফিজের টাকা ছাড় দিয়েছিলেন এবং পৌরসভার সভানেত্রী বীথিকা দেব বিভিন্নভাবে পৌরসভার পক্ষে সহযোগিতা করেছেন।

প্রায় ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার প্রায় ১২০০ বর্গফুটের প্রথম দফায় বঙ্গভবনের কাজের পর ৩ আগস্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ১৮ শ্রাবণ ১৪১৫ বাংলা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব বঙ্গভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ওইদিন আসামের মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায়, প্রধান অতিথি, আঁশিয়ার সভানেত্রী সুস্মিতা দেব প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। এই হল ‘বঙ্গভবন’ নির্মাণের প্রথম পর্ব। সম্প্রসারিত বঙ্গভবন তৈরি করার সময় সবারই ইচ্ছা ছিল প্রথম নির্মিত ঘরগুলো যেন রক্ষা করা হয় এবং যে অনুযায়ী নবনির্মিত ভবনের সঙ্গে ওই সাবেক অংশটিও সুকৌশলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ প্রথম পর্যায়ের ওই ভবনের সঙ্গে আমাদের অনেকের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

# বঙ্গভবন-আমার কথা

দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সম্মেলনের শিলচরে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গভবন' সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিছু বলা বা লেখা একান্ত প্রয়োজন। তবুও কিছু ব্যক্তিগত কথা এসে পড়ে। তাই ব্যক্তিগত কথা দিয়েই শুরু করছি।

সরকারি চাকরিতে কর্মরত থাকা অবস্থাতেই বঙ্গসাহিত্য ও সম্মেলনের প্রতি একটা আকর্ষণ ও দুর্বলতা আমার মনের মধ্যে ছিল। করিমগঞ্জ ও শিলচরে অনুষ্ঠিত একাধিক বার্ষিক/দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থেকেছি। সম্মেলনের একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে ২০০৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমিতির দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলাম। খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সভাতেই আমাকে কাছাড় জেলা সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়।

সেই বছরের মার্চ মাসে করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের অব্যবহিত পরে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জেলা সমিতির প্রথম কার্যকরী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ভবন নির্মাণের জমির জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকবর্গের নিকট আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সভাতে জেলা সমিতির নামে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট খোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার কয়েক দিন পূর্বে অর্থাৎ মে মাসের ৫ তারিখে জেলা সমিতির সভাপতি হিসাবে স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণের জন্য একখানা আবেদন জেলা সভাপতি হিসাবে কাছাড় জেলার উপায়ুক্তের নিকট দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে শিলচরের বাইরের সচল ও সম্ভাব্য ১৮টি আঞ্চলিক সমিতির জন্য সরকারি জমি বণ্টনের অনুরোধ জানিয়ে কাছাড় জেলা ভূ-বাসন আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। জেলা ভূ-বাসন আধিকারিক লিখিতভাবে তাঁর অধীনস্থ আধিকারিকদের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু বিশেষভাবে তদ্বির নিতে অক্ষমতার জন্য এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি।

শিলচর শহরে সরকারি জমি পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী হওয়ায় ২০০৩ সনের ১৯ অক্টোবর জেলা সমিতির বর্ধিত সভায় মূল প্রস্তাব সংশোধন ক্রমে তেরোজন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্মাণ সমিতি গঠিত হয়। সদস্যরা ছিলেন- দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, অনন্ত দেব, সুজিত কুমার ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস, সমীর কুমার দাস,

প্রদীপ আচার্য, শান্তনু দাস, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, তৈমুর রাজা চৌধুরী, সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামলকান্তি দেব, বিনোদবিহারী দেবনাথ ও প্রণব কুমার দাস।

তখন পর্যন্ত জেলা সমিতির হাতে কোনও অর্থ ছিল না। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সম্মেলনের বরিষ্ঠ সদস্য অনন্ত দেব মহাশয় যিনি সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি জেলা সমিতির সম্পাদক প্রদীপ আচার্যকে ডেকে তাঁর হাতে গচ্ছিত অর্থ ভবন নির্মাণের জন্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেই বৎসরের ১৩ ডিসেম্বর জেলা কমিটির বর্ধিত জরুরি সভায় এক লক্ষ টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট এবং নগদ তিন হাজার কুড়ি টাকা হস্তান্তর করেন।

একটি বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য ভাবনাচিন্তা শুরু হওয়া থেকেই কার্যকরী সমিতির সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ভবন নির্মাণের বিষয়ে লক্ষণীয় উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি এই সময়কালে জেলা সমিতির বিভিন্ন কার্যসূচি যথারীতি উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়। এই সব কাজে সম্পাদক প্রদীপ আচার্যের দৌড়ঝাঁপ এবং ঘন ঘন বৈঠক ডেকে আলোচনা ও পরামর্শ নেওয়ার প্রয়াস আমার কাছে আজ অসাধারণ বলে মনে হয়। লক্ষণীয় যে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠনের এক বৎসরের মধ্যে ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ হাতে আসে এবং ভবন নির্মাণ উপসমিতিও গঠিত হয়।

এবার আসি ভবন নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহের বিষয়ে। কাছাড় জেলার উপায়ুক্তের নিকট ২০০৩ এর মে মাসে আবেদন জানানোর পর ভূবাসন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং বর্তমানে যে স্থানে বঙ্গভবন অবস্থিত তারই একটা অংশ বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ভূ-বাসন আধিকারিক উপায়ুক্তের নিকট প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাব যাতে পরবর্তী মহকুমাভিত্তিক জমি বণ্টন উপদেষ্টা কমিটিতে উত্থাপিত এবং অনুমোদিত হয় সেজন্য উপদেষ্টা কমিটির প্রায় সকল সদস্যের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ রাখা হয়। এত তোড়জোর করার প্রধান কারণ হল প্রস্তাবিত ভূমিটি বণ্টনযোগ্য সাধারণ খাস জমি ছিল না, সেটা ছিল জেলা আদালতের সংরক্ষিত জমি এবং সেই মুহূর্তে শিলচর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নামে নির্দিষ্ট। অবশেষে ২০০৪ সনের ২২ জানুয়ারি ভূমি বণ্টন উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসে এবং ৮ নং প্রস্তাবে ৫ কাঠা জমি বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের নামে বণ্টনের অনুমোদন দেওয়া হয়। সেই বৎসরের ২৫ মার্চ তারিখে প্রস্তাবটি উপায়ুক্ত আসাম সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রস্তাবে একটি ভুল ছিল যা আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। প্রস্তাব ছিল ভূমি 'বন্দোবস্তের'-যার জন্য জমির মূল্যের প্রিমিয়াম দিতে হত। তাই উপায়ুক্তের সঙ্গে দেখা করে ভূমি বন্দোবস্তের প্রস্তাবের স্থলে ভূমি বণ্টনের সংশোধিত নতুন প্রস্তাব পাঠানো হয়। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। জেলা সভাপতি হিসাবে আমি ও সম্পাদক হিসাবে প্রদীপ আচার্য সমিতির টাকা পয়সার হিসাবপত্র যথাযথভাবে রাখার তাগিদ অনুভব করি, তাই কলেজ রোডের কালিদাস চৌধুরীর বাড়িতে যাই এই বিষয়ে তাঁর উপদেশ নেওয়ার জন্য। কয়েক মিনিট কথাবার্তার পরই তিনি বলেন রাজ্যের মন্ত্রী গৌতম রায় মহাশয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত কাজের জন্য তিনি দেখা করতে যাবেন। তখনই আমি ও প্রদীপ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নেওয়ার জন্য কালিদাস চৌধুরীর সঙ্গে সার্কিট হাউসে চলে যাই। কালিদাস চৌধুরী তাঁর ব্যক্তিগত কথা বলার পর আমি মন্ত্রীকে বঙ্গসাহিত্যের জমির যে প্রস্তাব সচিবালয়ে গেছে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলি। মন্ত্রী গৌতম রায় মহাশয় উৎসাহ দেখিয়ে বলেন তিনি দিসপুর থেকে জমি বণ্টনের সরকারি অনুমোদন পাঠিয়ে দেবেন এবং তাঁর

সঙ্গে আসা সুজন দত্তের নিকট সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দেওয়ার জন্য বলেন। মন্ত্রী শ্রীরায় আরও উৎসাহিত হয়ে বলেন যে ঘর নির্মাণের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন। মন্ত্রীর এই ঘোষণা আমাদের কাছে মেঘ না চাইতেই জল পাওয়ার মতো মনে হয়েছিল।

আজ দশ বৎসর পর মন্ত্রী গৌতম রায়ের সঙ্গে সেদিনের সাক্ষাৎকার এক সুদুরপ্রসারী ঘটনা বলে মনে হয়। কারণ সেদিনের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়েই বঙ্গভবন নির্মাণের কাজে মন্ত্রী গৌতম রায় জড়িয়ে পড়েন। তাঁর সাহায্য ছাড়াও বঙ্গভবন অবশ্যই হত কিন্তু সেদিনের পর বঙ্গভবনের প্রথম অংশের নির্মাণ এবং বর্তমান ভবনের সম্প্রসারিত অংশের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে তা হয়তো আমাদের পক্ষে স্বপ্নই থেকে যেতো।

ফিরে আসি ভবন নির্মাণর জন্য জমি বণ্টনের কথায়। ২০০৪ সনের অক্টোবর মাসে মৃদুল মজুমদার ভূমি বণ্টনের জমির বণ্টন পত্র সম্পাদকের হাতে তুলে দেন। জেলা সমিতির পক্ষ থেকে ডিসি কার্যালয়ে যোগাযোগ করা হলে ২ সেপ্টেম্বর এক চিঠিযোগে উপায়ুক্ত শ্রীমতী সুনন্দা সেনগুপ্ত কাছাড় জেলার ভূ-বাসন আধিকারিককে জমির দখল সমঝে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুসারে সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখে প্রদত্ত পাঁচ কাঠা জমির সীমানা সহ দখল সমঝে দিয়ে জমি হস্তান্তরের প্রমাণপত্র দেওয়া হয়।

জমি পাওয়ার পরও আমাদের উৎসাহ শেষ হয়নি। তারপর ৩০/১১/২০০৪-এ উপায়ুক্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে একখানা চিঠি দেওয়া হয় এবং সেই চিঠিতে সম্মেলনের প্রয়োজনীয় অডিটোরিয়াম, আর্কাইভ, লাইব্রেরি, কনফারেন্স হল, প্রকাশনা কেন্দ্র, অতিথি ভবন, আর্ট গ্যালারি ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য প্রাপ্ত জমি সংলগ্ন আরও পাঁচ কাঠা জমির জন্য আবেদন জানানো হয়। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে উপায়ুক্ত ভুবাসন আধিকারিকের নিকট প্রতিবেদন চেয়ে পাঠান এবং মহকুমা ভূমি বণ্টন কমিটির অনুমোদন নিয়ে যথারীতি সম্মেলনের নামে এর সুপারিশ করে রাজ্য সরকারের নিকট পাঠান। অতিরিক্ত ভূমি অনুমোদন ২০০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে উপায়ুক্তের নিকট আসে এবং উপায়ুক্তের নির্দেশ মত ২০ ডিসেম্বর ভুবাসন আধিকারিকের পক্ষে সরকার অনুমোদিত চার কাঠা জমির দখল প্রমাণপত্র সহ আমাদের সমঝে দেওয়া হয়। এখানেও একটি কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দ্বিতীয় কিস্তির চার কাঠা জমি সরকার কর্তৃক বণ্টনের সময় গৌতম রায় রাজস্ববিভাগের মন্ত্রীত্বের দায়িত্বে ছিলেন। নতুন নিয়ম অনুসারে শহরাঞ্চলে জমি আবণ্টনে মন্ত্রীসভার অনুমোদন বাধ্যতামূলক ছিল। এবারও আমাদের জমি পাবার জন্য দিসপুর সচিবালয়ে যেতে হয়নি।

আবার ভবন নির্মাণের অর্থের কথায় ফিরে আসি। যেহেতু সম্মেলনের নিজস্ব কোনও জমি ছিল না তাই ভবন নির্মাণের তহবিলের প্রশ্ন এতদিন উঠেনি। যদিও তখন জেলা সমিতির সদস্য সংখ্যা পাঁচশতের কাছাকাছি ছিল, দ্বিবার্ষিক সদস্য চাঁদা মাত্র কুড়ি টাকা ছিল বলে সঞ্চয়েরও কোনও সুযোগ ছিল না। ১৯৯১ এবং ১৯৯৪ সালে শিলচরে যথাক্রমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের একাদশ ও চতুর্দশ অধিবেশনের উদ্বৃত্ত এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকার উপর নির্ভর করে আমরা অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে আসামের আবগারি মন্ত্রী গৌতম রায় ছয় লক্ষ, কেন্দ্রীয় ভারীশিল্প মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব পাঁচ লক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আঁশিয়ার পক্ষে শ্রীমতী সুস্মিতা দেব পাঁচ লক্ষ, সোনাই বিধানসভার তৎকালীন বিধায়ক কুতুব আহমেদ মজুমদারের নিকট থেকে পঁচিশ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট যোলো লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আমাদের হাতে আসে। উপরোক্ত অর্থ একদিনে আসেনি। প্রায় এক বৎসর সময়কালের মধ্যে এসেছিল।

সম্মেলনের কার্যকরী সমিতির ৩০/১০/২০০৫ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০০৫ সনের ৭ ডিসেম্বর তারিখে শিলান্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা সমিতির সদস্য এবং বিশিষ্টজনদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব ও আসামের রাজস্ব ও আবগারি মন্ত্রী গৌতম রায় ও আরও বিশিষ্টজনেরা। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীরায় বলেন যে সদরঘাট সেতু পেরিয়ে শহরে প্রবেশ করেই চোখে পড়বে বাঙালিদের এই স্মারক ভবন। তাই এটি হওয়া চাই সবদিক থেকে দর্শনীয়।

ভবন নির্মাণের নকশা ও এস্টিমেট তৈরি করেন এনআইটির অধ্যাপক অসীম দে। মোট ৬ টি পিলার সম্মিলিত প্রায় ১১০০ বর্গফুট আয়তনের ভবনের কাজ শুরু হয়। প্রাপ্ত জমিতে ব্রিটিশ আমলের শতাধিক বৎসরের পুরানো পুকুর থাকাতে পাম্প লাগিয়ে জল নিষ্কাশন ও বহু ট্রাক মাটি ফেলে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। পুকুরের পাড় সংলগ্ন সম্মিলিত জমি ভরাট করে বাঁশ ও টিনের চাল দিয়ে একটি অস্থায়ী গৃহ কাজের সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে ছোটোখাটো বৈঠকও এই গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। নির্মাণ সমিতির পক্ষে নির্মাণের কাজ পরিচালনার জন্য শান্তনু দাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি নিজ কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও ভবন নির্মাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নির্মাণ কাজ চলাকালীন সদস্যদের অনেকেই প্রত্যেকদিনই উপস্থিত হতেন। প্রায় ছয় সাত মাসের মধ্যে পাইলিং করে পিলার বসানোর ও টাইবিমের কাজ সম্পন্ন হয়। এতবড় কাজের দায়িত্বে ভয়েরও কারণ থাকে তাই কাজ চলাকালীন শহরের বিশিষ্টজনকে সুযোগমত এনে কাজ দেখানো হয়েছে। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতাম এটা Social Audit। বিশিষ্টজনের মধ্যে দীপক ভট্টাচার্য, বাদল দে, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় ও পরিমল শুরুবৈদ্যের নাম মনে আছে। ভবন নির্মাণের কাছ অগ্রসর হওয়ার পর দেখা গেল নির্মাণ কাজ সারাক্ষণ তদারকির প্রয়োজন আছে। যেহেতু সমিতি নিজেদের দায়িত্বেই কাজ চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জেলা সমিতির সিদ্ধান্তমতে তাই কাজের দায়িত্ব সমিতির সম্পাদক প্রদীপ আচার্যকে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর সমিতির পুরনো সদস্য বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে নির্মাণ উপসমিতির কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাজ চলাকালীন এনআইটির অধ্যাপক অসীম দে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেছেন। কিছুদিন পর আমার সহপাঠী ইঞ্জিনিয়ার শিলচর পলিটেকনিকের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রণব কুমার দাসকে অনুরোধ করাতে তিনি নিয়মিত দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অসীম দে ও প্রণব কুমার দাস তাঁদের মূল্যবান সময় এই কাজে ব্যয় করেন। একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই কাজের জন্য তাঁরা কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

ভবন নির্মাণের সংগৃহীত অর্থ থেকে এক টাকাও নির্মাণ কাজের বাইরে অন্যভাবে খরচ করা হয়নি এবং কোনও সদস্যই দায়িত্ব পালনের জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেননি।

জমি প্রাপ্তি ও ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কত দৌড়ঝাঁপ ও পরিশ্রম করতে হয়েছে তা ভাবলে নিজেরই অবিশ্বাস হয়। ভবন নির্মাণের কাজ চলাকালীন মন্ত্রী গৌতম রায় সুযোগ মত নির্মাণস্থলে আসতেন এবং কাজের অগ্রগতি দেখে পরামর্শাদি দিতেন। হঠাৎ একদিন মন্ত্রীর নজরে আসে বঙ্গভবনের জন্য প্রদত্ত ভূমির উত্তরদিকে P. W.D. রাস্তা সংলগ্ন ঘরগুলি। প্রশ্নের উত্তরে যখন বলা হল যে ঘরগুলো উপায়ুক্তের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের, তখনই তিনি বললেন যে এই ঘরগুলোকে স্থানান্তরিত করতে হবে। তারপর যখনই তিনি বঙ্গভবনে

এসেছেন তখনই কাছাড়ের উপায়ুক্ত গৌতম গাঙ্গুলি মহাশয়কে ডেকে এনে ঘরগুলো সরানোর ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। এরপর শুরু হয় আমাদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে উপায়ুক্তকে চিঠি মারফত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ এবং উপায়ুক্তেরর পক্ষ থেকে সরকারের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান। অবশেষে সরকারের টাউন এন্ড কান্ট্রি প্লানিং বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথম কিস্তির চার লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয় এবং ওই বিভাগেরই তত্ত্বাবধানে অফিস পাড়ার ডাকবাংলোর পেছনে ঘরগুলো নতুনভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়।

এতসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে আরও যেসব কাজের কথা মনে পড়ে তা মোটামুটি নিম্নরূপ:- ভবন নির্মাণের অনুমতির জন্য নকশাদি দিয়ে শিলচর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন দাখিল।

শিলচর পৌরসভার চেয়ারম্যানের নিকট বঙ্গভবনের হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার আবেদন ও পৌরসভা কর্তৃক আদায়কৃত ট্যাক্স মকুব করা এবং বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পৌরসভার No objection সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করা। প্রায় একই সাথে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ থেকে পানীয়জল সংযোগের জন্য পৌরসভার নিকট আবেদন জানানো হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ ও নলবাহিত জলসংযোগের কাজ সম্পন্ন হয়। নতুন ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ আমাদের সমিতির প্রবীণ সদস্য রন্টু বাগচীর তত্ত্বাবধানে অতি সুন্দরভাবে যথাসময়ে সম্পন্ন হয়। মন্ত্রী গৌতম রায় মহাশয়ের পরামর্শে বঙ্গভবন সম্প্রসারণের জন্য Untide Fund থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য আমাদের হাতে প্রস্তুত থাকা এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকার একটি Plan estimate উপায়ুক্তের নিকট দাখিল করা হয়। Plan estimateটি তৈরি করেন পলিটেকনিকের অধ্যাপক প্রণব কুমার দাসের ছাত্র সুরজিত নন্দী। পরবর্তীতে বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষ থেকে আসামের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবকে (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ) পত্রযোগে অর্থ বরাদ্দের জন্য চিঠি দেওয়া হয়।

এবার আসি ভবনের নামকরণ নিয়ে। কার্যকরী সমিতির ২০০৮ সনের ৬ জুলাই তারিখের সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কেউ প্রস্তাব করেন 'শহীদ স্মৃতি ভবন' আবার কেউ প্রস্তাব করেন ভাষা আন্দোলনের স্মরণে নাম রাখা হউক 'উনিশে'। সম্পাদক প্রস্তাব করেন 'বঙ্গভবন' যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রাপ্ত জমিতে গভীর পুকুর থাকায় সেটা ভরাট করা সমিতির এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শিলচর পৌরসভার সঙ্গে আলোচনাক্রমে পৌরসভা কর্তৃক খনন করা বিভিন্ন নর্দমার মাটি বেশ কিছুদিন ধরে ফেলা হল। বর্তমান শিলচর আঞ্চলিক সমিতির সহ সভাপতি পরিতোষ দে ও তৎকালীন জেলা সম্পাদক প্রদীপ আচার্য অনেক রাত পর্যন্ত উপস্থিত থেকে মাটি ফেলার কাজে তদারকি করেন।

ভবন নির্মাণের কাজে আর যেসব সংস্থা ও ব্যক্তির নিকট থেকে সমিতি সাহায্য পেয়েছে তাদের নাম উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। উপায়ুক্তের রাজস্ববিভাগ, ভূবাসন আধিকারিকের কার্যালয় শিলচর পৌরসভা, শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী, বীথিকা দেব, সুজন দত্ত, অসীম দে, মৃদুল মজুমদার, রাহুল দাশগুপ্ত, প্রণব কুমার দাস, সুরজিত নন্দী এবং আরও অনেকে। ভবন নির্মাণ চলাকালীন সময়ে পূর্বাপর যথারীতি শিলচর নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও ডিএনএনকে বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ আমাদের প্রস্তুতিপর্বের সভা ও অনুষ্ঠানাদির অনুমতি দেওয়ার জন্য সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতি স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ। অবশেষে কার্যকরী সমিতির ২৭/৭/০৮ তারিখে সভায় উদ্বোধনের দিন সাব্যস্ত হয় পরের মাসের ৩ তারিখ রবিবার। নতুন ভবনের পূর্বদিকে যে খালি জায়গা

ছিল সেখানে এবং তারও পূর্বদিকে ছোট রাস্তা এবং পৌরসভার পাশে যে মিষ্টির দোকান সেই অংশে মঞ্চ এবং প্যান্ডেল বানানোর সিদ্ধান্ত হয়। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় চক্কেশ্বরী ভাণ্ডারের মালিক জয় বরদিয়াকে। সেই সভায় নতুন ভবনের উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, বঙ্গভবন সম্পর্কীয় প্রতিবেদন পাঠ, অনুষ্ঠানের সভাপতি, অনুষ্ঠানের ঘোষক এবং সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কে করবেন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কাছাড় জেলার সকল আঞ্চলিকের সদস্যদের এবং করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির জেলা সমিতিকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো স্থির হয়। অনুষ্ঠানে সবাইকে জলযোগে আপ্যায়ন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কার্যকরী সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, সম্পাদক প্রদীপ আচার্য, কেন্দ্রীয় সমিতির সহসভাপতি সুজিত ভট্টাচার্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদক বিনোদ বিহারী দেবনাথ সহ শ্যামলকান্তি দেব, তৈমুর রাজা চৌধুরী, শান্তনু দাস, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অনিল পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেন এই নতুন ভবন বরাক উপত্যকার বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর শিল্প সাহিত্য তথা সংস্কৃতির বিকাশে এক নতুন দিশা দেবে। উপস্থিত সাংবাদিকগণকে কর্মকর্তারা আরও জানান যে এই ভবনটি পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত করে তৈরি করা হবে ও তাতে থাকবে সংগ্রহশালা, লাইব্রেরি, প্রেক্ষাগৃহ, আর্ট গ্যালারি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে প্রায় দেড় কোটি টাকার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়।

উদ্বোধনের আগের দিনই বঙ্গভবন প্রাঙ্গণ সুন্দর সাজে সেজে ওঠে এবং সব সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরের দিন অর্থাৎ ৩রা আগস্ট ২০০৮ সন (১৮ শ্রাবণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ) রবিবার বেলা ১০টায় অব্যবহিত পর থেকেই সম্মানিত অতিথিগণ এসে উপস্থিত হতে থাকেন। আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যে ফিতা কেটে নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব এবং ভবনের ভিতরেই সুন্দরভাবে স্থাপন করা প্রদীপ প্রজ্বলন করেন আসামের মন্ত্রী গৌতম রায়। নতুন ভবনটি সকল অভ্যাগতের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এর পরই সভার কাজ শুরুর ঘোষণা করেন ঘোষক সব্যসাচী পুরকায়স্থ। একে একে অভ্যাগতদের সমাদর সহকারে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। মঞ্চে আসন অলংকৃত করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব, রাজ্যের মন্ত্রী গৌতম রায়, করিমগঞ্জের সাংসদ ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য, প্রাক্তন সাংসদ কমলেন্দু ভট্টাচার্য, উপায়ুক্তের প্রতিনিধি অতিরিক্ত উপায়ুক্ত এইচ. এন. লস্কর, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান (বর্তমানে প্রয়াত) সুদীপ দত্ত, আঁশিয়ার চেয়ারপার্সন শ্রীমতী সুস্মিতা দেব ও জেলাশাসক গৌতম গাঙ্গুলী জায়া সঞ্চিতা গাঙ্গুলী, কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার ভায়োলেট বরুয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে প্রয়াত শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী ও তরুণ দাস, সম্মেলনের জ্যেষ্ঠ সদস্য অনন্ত দেব, জেলা সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সুজিত ভট্টাচার্য, জেলা সমিতির তৎকালীন সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস ও প্রদীপ আচার্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস। একে একে মঞ্চে উপবিষ্ট সকল সম্মানিত অভ্যাগতদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত সৌরীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পরিবেশন করেন কাছাড় জেলা সমিতির শিল্পীবৃন্দ। যতদূর মনে পড়ে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সৌরীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, লুৎফা আরা চৌধুরী, বাপী রায়, তাপসী বণিক, সত্যরঞ্জন রায়, গৌরব বণিক, শুভদীপ আচার্য, গৌরী শুক্লবৈদ্য, মনোজিত দত্ত ও সঞ্জয় দেব।

সভার শুরুতে সম্পাদক আচার্য স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর উদ্বোধক সন্তোষমোহন দেব তাঁর ভাষণে বলেন কোনও ভাষা কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এই অঞ্চলের মানুষ তা প্রমাণ করেছেন। বরাক ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সমন্বয়ের সোপান গড়ে তোলারও তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গৌতম রায় বলেন এই ভবন আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল। এটা না করে দেওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধিদের গাফিলতিকে তিনি দায়ী করে দোষ নিজের ঘাড়েও টেনে নেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন শিলচরের এই বঙ্গভবন ভবিষ্যতে বাঙালিদের গর্বের কারণ হবে। বঙ্গভবনের নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ উচ্চমানের হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। সাংসদ ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য বলেন মন্ত্রী গৌতম রায় স্বপ্নদর্শী। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, তরুণ দাস, ভায়োলেট বরুয়া, সুদীপ দত্ত, হোসেন আহমেদ লস্কর। অনুষ্ঠানের সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস বরাক উপত্যকায় যে চোরাগুপ্তাভাবে ভাষিক আগ্রাসন চলছে সে সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে দেন। সভাপতির ভাষণের পর ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন তৈমুর রাজা চৌধুরী।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মধ্যেই বঙ্গভবন গড়ে তোলার কাজ থেমে থাকেনি। গৃহস্থ বাড়ির মতো উঠান ও সীমানাজুড়ে বাঁশের ফেন্সিং দেওয়া, নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য প্রয়াত দেবেন্দ্রশংকর দত্ত ও প্রয়াত অনিল ওরফে কার্তিক বিশ্বাস মহাশয়ের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে দান হিসাবে আলমারি গ্রহণ, শিলচর শহরের প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্কে চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি সামগ্রী সাহায্য হিসাবে পাওয়ার আবেদন, এমনকি Goodrick Tea Company যাদের কাছাড় জেলায় চা বাগান আছে তাদের কলকাতার কার্যালয়ের সাথে বঙ্গভবনে লাইব্রেরি গড়ে তোলার জন্য সাহায্যপ্রার্থী হয়ে চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর বঙ্গভবনের সম্মুখভাগের নয় কাঠা খাস জমি পাওয়ার জন্য আবেদন এবং সেই আবেদন ২০০৯ সনের ১২ নভেম্বর তারিখে মহকুমা ভূমি বণ্টন কমিটির অনুমোদনসহ জেলা উপায়ুক্তের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানোর ব্যাপারে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বঙ্গভবনের প্রথম পর্যায়ের কাজের বিবরণ শেষ হল। পরবর্তী পর্ব হল আরেক ইতিহাস। সে ইতিহাস তো এ ক্ষুদ্র পরিসরে ধরা সম্ভব নয়। এ কাজটুকু সম্মেলনের অন্য সহযোগীর হাতেই থাকুক এবং এ স্মারক পত্রিকায়ই তা লিপিবদ্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

# সম্প্রসারিত বঙ্গভবন

সরকারি অনুদান গ্রহণ

হাতে হাত মিলিয়ে সন্তোষমোহন দেব ও গৌতম রায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে

ওরা কাজ করে ...

নির্মীয়মান ভবন পরিদর্শনে অতিথিরা

কর্মী সকাশে বিশিষ্টজনেরা

কর্ম পরিদর্শনে কর্মকর্তারা

প্রেক্ষাগৃহ পর্যবেক্ষণ

সম্মেলনের কর্মকর্তারা কাজের অগ্রগতিতে তৃপ্ত

# বঙ্গভবন আদিপর্ব

## প্রদীপ আচার্য

১৯৯৯ সালে নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় আমাকে শিলচর আঞ্চলিক সমিতির সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করা হয়। যদিও নয়ের দশকের শুরু থেকেই শিলচর আঞ্চলিক সমিতির কার্যকরী সদস্য হিসাবে কাজ করে গেছি। আমার প্রিয় স্যার প্রসূনবাবু (প্রসুনকান্তি দেব) প্রায় প্রতিদিনই আমার আর্ট স্টুডিওতে আসতেন এবং বঙ্গসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন। এই আলোচনায় একদিকে যেমন সম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রসঙ্গ আসত তেমনি আসত সম্মেলনের একটি স্থায়ী ঠিকানার প্রশ্নটিও। একদিন স্যার বললেন করিমগঞ্জে ও করিমগঞ্জ জেলা সমিতির জন্য সরকার থেকে নিজস্ব কার্যালয়ের ভবনের জন্য ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে কিন্তু কাছাড় জেলা সমিতির স্থায়ী কোনও ঠিকানা আজও হল না। তবে দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস এবং সন্তোষ কুমার গুপ্ত এ দু'জন ব্যক্তিকে এবার সম্মেলনের সদস্য করেছি যারা করিমগঞ্জ বঙ্গসাহিত্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান তথা অধিবেশনেও বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। আবার দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস মহাশয় করিমগঞ্জ জেলা সমিতির জমি পাওয়ার ব্যাপারেও সহায়তা করেছেন। এসব কথা বলে স্যার বললেন, 'তুমি কিন্তু সব সময় ওদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে'। আমিও যথারীতি এ নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করে গেছি। ২০০১ সালে সম্মেলনের শিলচর আঞ্চলিক কার্যকরী সমিতি গঠনের সময় দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়কে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে আসার চেষ্টা করেও সফল হইনি। ইতিমধ্যেই দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা বাড়তে লাগল। এরই মধ্যে এসে গেল আবার নতুন কার্যকরী সমিতি গঠন পর্ব। ০১-০২-০৩ (১৮ই মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ) তারিখে শিলচর নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা। এই সভায় বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির সভাপতি হিসাবে দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসকে মনোনীত করা হল এবং সম্পাদক হিসাবে আমাকে। প্রভাস সেন মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা কদিন পরই শিলচরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের বিংশতিতম অধিবেশন শেষ হলে কাছাড় জেলার নবনির্বাচিত সমিতি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নব-নির্বাচিত কাছাড় জেলা সমিতির প্রথম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় স্থানীয় গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানে।

অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি ফেরার পর রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বিশ্বাসদা (দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস সম্বোধনে আমার ঈষৎ কুণ্ঠা আঁচ করে এই সমাধানটা তিনিই বাতলে দিয়েছিলেন। ফোন করে অনুষ্ঠানের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করে জিজ্ঞেস করলেন 'আচ্ছা বলতো বঙ্গসাহিত্যের অনুষ্ঠানে লোক কম হয় কেন?' আমার তাৎক্ষণিক জবাব, 'আমাদের বসার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই তাই আমরা কোন অনুষ্ঠানকে সেভাবে organise করতে পারি না, হয়ত এজন্যই লোক কম হয়।' শুনে তিনি বললেন, 'কাল দিনের বেলা তুমি ফ্রি আছ কি?'— 'কেন?' জিজ্ঞেস করলে বিশ্বাসদা বললেন, 'না, তাহলে তোমাকে নিয়ে একটু ল্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসে যেতাম।' শুনে বললাম আমি ফ্রি থাকি আর নাই বা থাকি, যাব। তিনি বললেন 'তাহলে সকাল এগারোটায় আমার বাড়ি চলে আসবে।' যথারীতি সকালে হাজির হলে তিনিও আমার বাইকে চেপে বসলেন। সেটেলমেন্ট অফিসে আমরা ঢুকলাম। একে একে করণিক থেকে আধিকারিক অনেকের সাথে পরিচয় করে দিলেন। লক্ষ্য করলাম বিশ্বাসদা সম্পর্কে অফিসের সবার গভীর শ্রদ্ধাবোধ। যা'ই হোক বিশ্বাসদা কাছাড় জেলা সমিতির কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাস জমির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলেন আর সেদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল আমাদের অন্য এক মিশন। এরপর ২৭ মে ২০০৩ কাছাড় জেলা কার্যকরী সমিতির প্রথম বৈঠকে জেলা সমিতির স্থায়ী কার্যালয় ভবন না থাকায় যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা নিবারণকল্পে কাছাড় জেলা সমিতির নিজস্ব জায়গা তথা ভবনের জন্য জেলা সমিতির পথ থেকে সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিক বর্গের কাছে আবেদন জানানোর জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যদিও ইতিমধ্যেই অর্থাৎ ৫ মে ২০০৩ আমরা উপায়ুক্ত প্রদীপ দাস মহাশয়ের কাছে আমাদের আবেদন দাখিল করে নিয়েছিলাম। যাতে পরবর্তী ল্যান্ড এডভাইসরি কমিটিতে আলোচ্য সূচিতে এটা স্থান পায়। ইতিমধ্যেই এক অনুষ্ঠানে অনন্ত দেব মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন অনেক কথা আছে সম্ভব হলে জেলা সভাপতিকেও নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। একদিন সময় করে সভাপতিকে নিয়ে অনন্ত দেব মহাশয়ের বাড়িতে হাজির হলাম। তিনি আনন্দিত হলেন। প্রস্তাবিত জমির ব্যাপারে অনেক কথা হল। তিনি বলেন, 'একাদশ অধিবেশনের উদ্বত্ত টাকা ব্যাঙ্কে রাখা আছে এটা আমি এই জেলা সমিতির কাছে হস্তান্তর করতে চাই যাতে প্রস্তাবিত কার্যালয় ভবনের কাজে এটা লাগতে পারে।' আমি একটু অবাকই হয়ে ছিলাম কারণ অনেকদিন থেকেই এই উদ্বৃত্ত টাকা হস্তান্তরের জন্য সম্মেলন কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে আসছিলেন কিন্তু তিনি রাজি হননি।

১ কার্তিক ১৪১০ বঙ্গাব্দ (১৯ অক্টোবর ২০০৩) নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কাছাড় জেলা সমিতির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন 'কাছাড় জেলা ভবন নির্মাণ কমিটি' নামে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়। অনধিক নয় জনের এই সমিতিতে প্রয়োজনে আরও বিশিষ্ট সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সমিতিটির সদস্যবৃন্দ—

১। সভাপতি- দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস
২। সম্পাদক- প্রদীপ আচার্য
৩। সদস্য- সুজিৎ কুমার ভট্টাচার্য
৪। সদস্য- অনন্ত দেব
৫। সদস্য- মৃণাল কান্তি দত্তবিশ্বাস
৬। সদস্য- সমীর কুমার দাস

৭। সদস্য- তৈমুর রাজা চৌধুরী

৮। সদস্য- শান্তনু দাস

৯। সদস্য- বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য কাছাড় জেলা সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সৌরীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যকে নির্মাণ কমিটির সদস্য করা হয়।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৪১০ বঙ্গাব্দ (১৩ ডিসেম্বর ২০০৩) বিকেল চারটায় কাছাড় জেলা কার্যকরী সমিতির এক বর্ধিত জরুরি সভা আহ্বান করা হয়।

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে শিলচরে অনুষ্ঠিত বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের উদ্বৃত্ত অর্থ তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ (একাদশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির) অনন্ত দেব জেলা সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস এবং সম্পাদক প্রদীপ আচার্যের হাতে তুলে দেন। এতে ১ লক্ষ টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট এবং নগদ ৩,৮২০ (তিন হাজার আটশত কুড়ি) টাকা। সভা একাদশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সরোজ কুমার দাস এবং সম্পাদক বিজিৎ চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইতিমধ্যেই ল্যান্ড এডভাইসরি কমিটিতে যাতে জমি সংক্রান্ত আমাদের আবেদন মঞ্জুর হয় তার জন্য ল্যান্ড এডভাইসরি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে কেন আমাদের একখণ্ড জমির প্রয়োজন তা তাদের বুঝিয়ে বলার সিদ্ধান্ত হয়। এই লক্ষ্যে প্রথমেই আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। নির্মাণ কমিটির সদস্য বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন। সন্তোষমোহন দেবের পরামর্শক্রমে তৎক্ষণাৎই সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য জেলা উপায়ুক্তের প্রতি একখানা পত্র লেখেন এবং শ্রীদেব পত্রটিতে সাক্ষর করে জেলা উপায়ুক্তের কাছে প্রেরণ করেন। সন্তোষমোহন দেব আশ্বাস দেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। ল্যান্ড এডভাইসরি কমিটির সভায় সম্মেলনের জমির সেই আবেদন মঞ্জুর হয়ে যায়। এরপর তা আসাম সরকারের স্বীকৃতির জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দিসপুর সচিবালয়ে পাঠানো হয়। সেখান থেকে এটা যাতে সরকারি অনুমোদন লাভ করে এর চেষ্টা অব্যাহত থাকে। সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি ড. সুবীর করের ভাই সচিবালয়ের বিশিষ্ট কর্মী। তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। এভাবেই চলতে থাকে আমাদের অপেক্ষা। আর এরই মধ্যে আসামের মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায় ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী কালীদাস চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সভাপতি ও সম্পাদক শিলচর আবর্তভবনে মন্ত্রী গৌতম রায়ের সঙ্গে দেখা করে জমির ব্যাপারে আবেদন জানাই। আমাদের কাছ থেকে সব শুনে তিনি বললেন, 'জমির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন জমির ব্যবস্থা তো হবেই। আর আমি সেখানে আপনাদের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কার্যালয় বানানোর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দেব।' যদিও তখন পর্যন্ত আমরা আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে কোন আবেদন রাখিনি। খুবই উৎসাহিত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম। এরপর শুধুই অপেক্ষা ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক দুপুরে মন্ত্রী গৌতম রায়ের স্থানীয় প্রতিনিধি মৃদুল মজুমদারের একটি ফোন পেলাম, হ্যালো বলায় অন্য প্রান্ত থেকে বললেন 'আচার্যি এই মাত্র ডেপুটি কমিশনারে অফিসে একটি ফেক্স এসেছে যে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনকে আসাম সরকার থেকে এক টুকরো জায়গা দেওয়া হয়েছে। এটা কি তোমাদের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন? জায়গার পরিমাণ ১ বিঘা।' প্রথম কথাটায় লাফিয়ে উঠলাম কিন্তু দ্বিতীয় লাইন শুনে কিছুটা দমে গেলাম, তবুও আশায় বুক বেঁধে বললাম, 'হ্যাঁ, এটা আমাদেরই'। দমে যাওয়ার কারণটা ছিল আমরা আবেদনই করেছি দশ কাঠা

জায়গার জন্য সেখানে এক বিঘা অর্থাৎ বিশ কাঠা কী করে হবে? পরে বুঝলাম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মাপকাঠি আর এই অঞ্চলের জমির মাপকাঠি তো আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পাঁচ কাঠায় এক বিঘা যা আমাদের বরাক উপত্যকায় বিশ কাঠা। যাই হোক তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কোথায় আসব এক্ষুনি এটা দেখতে চাই।' মজুমদার বললেন, 'আমি এখন কংগ্রেস অফিসে আছি'। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ রেখে বাইক স্টার্ট দিলাম দু-তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। কাগজটা হাতে নিয়েই লাফিয়ে উঠলাম- হ্যাঁ এ তো আমাদেরই। মজুমদার এবং মন্ত্রী গৌতম রায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম সভাপতির বাড়িতে। ফ্যাক্স দেখে তিনিও ভীষণ আনন্দিত। আমরা একটু অবাক হলাম জায়গা দেওয়া হয়েছে পাঁচ কাঠা যদিও ল্যান্ড এডভাইসরি কমিটিতে দশ কাঠা জায়গাই অনুমোদন লাভ করেছিল। যাই হোক প্রথমে ভবন নির্মাণ কমিটির সদস্যদের এবং পরে যতটা সম্ভব বাকি সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সুখবরটা জানালাম। এরপর আমরা জেলা উপায়ুক্ত শ্রীমতী সুনন্দা সেনগুপ্ত মহাশয়ার সঙ্গে দেখা করে সরকারি প্রদত্ত জমি হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানাই। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার সদর সার্কেল, শিলচর-এর সঙ্গে ও সাক্ষাৎ করে হস্তান্তরের দিন ধার্য করা হয়। ২৯ নভেম্বর ২০০৪ অকারণে কিছুটা বিলম্ব ঘটল। নির্দিষ্ট দিনে আমরা অর্থাৎ নির্মাণ কমিটির সদস্য এবং জেলা কার্যকরী সমিতির সদস্যরা সদরঘাটের অরুণ কুমার চন্দ রোডের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছুলাম। ইতিপূর্বেই আমরা সভাপতি সম্পাদক সরকারি বিভাগীয় কর্মকর্তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু অন্তহীন প্রতীক্ষা। তখন আমাদের সদস্য তৈমুর রাজা চৌধুরীকে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি জেলা উপায়ুক্তের সাথে যোগাযোগ করে সরকারি আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। জমির সামনের রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল মাত্র চার ফুট, আমরা নিজেদের জন্য তো বটেই সেই সঙ্গে আমাদের পেছনের সারিতে প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সুবিধার কথাও মাথায় রেখে নিজেদের জায়গা ছেড়ে শুরুতেই রাস্তার সাথে আরও দশ ফুট জুড়ে দিই। জায়গাটা ছিল একটা ডোবা কচুরিপানা এবং আগাছায় পূর্ণ। ফিতে ধরার জন্য সরকারি কর্মী কেউ যেতে পারছে না পেছনের (পশ্চিম) দিকে। আমি অবশ্য আগে থেকেই সেটা আঁচ করে আমার দীর্ঘদিনের কর্মচারী, জলের সঙ্গে যার মিতালি, সেই মনীন্দ্র দাস সাধু নামে যে অধিক পরিচিত তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলাম। পরবর্তী সময়ে যে দীর্ঘদিন এই ভবন রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। সভাপতি বিশ্বাসদা অনেক দিন থেকেই নিজ খরচায় অনেকগুলো আর সি সি পিলার বানিয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক সাধু সেই কচুরিপানার উপর লিকলিকে একটা দুটো বাঁশ ফেলে পৌঁছে গেল ফিতে নিয়ে প্রায় একশো ফুট পশ্চিমে। জায়গা নির্দিষ্ট হল পেছনের বাকি অংশের জন্য আমাদের এবং ডিস্ট্রিক ব্রিজ অ্যাসোসিয়েশন, শিলচর-এর মাঝখানে দশ ফুট কোরিডর রাখা হল। দক্ষিণ দিকে ফিতে ধরতে গিয়ে আমরা দেখি বড়সড় কি যেন একটা নড়ছে। কচুরিপানা, আগাছা সরিয়ে দেখি একটা গরু তখনও জীবন্ত কবে এই ডোবায় পড়েছিল কে জানে। শুধু নাকটা উঁচিয়ে রেখে হৃদ্ স্পন্দনটাকে ধরে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা কজন চেষ্টা করলাম এটাকে উঠানোর। কিন্তু পারলাম না। পরে পৌরসভা থেকে শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে এসে বহু কষ্টে এটাকে ওঠানো হল। আশপাশের বাড়ি থেকে বস্তা জোগাড় করে প্রাণীটার শীত নিবারণের চেষ্টা করা হল।

দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসানে সবাই আনন্দিত কাছাড় জেলা সমিতির এক টুকরো জায়গা হয়েছে কিন্তু আমরা সভাপতি, সম্পাদক কিছুটা হতোদ্যম, কেননা মনে মনে যে প্লেন ছিল তা পাঁচ কাঠা জমিতে কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না। আমার এই বিমর্ষ ভাব দেখে অনন্ত দেব মহাশয় বললেন পাঁচ কাঠা তো অনেক জায়গা।

তুমি আমার বাড়ি যাবে। চার কাঠা জায়গাতে কতকিছু করা যায় আমি তোমাকে দেখাব। একে একে সবাই চলে গেলেন। বাঁশের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। হঠাৎ সভাপতি আমাকে বললেন 'প্রদীপ চল'। আমি বললাম 'কোথায়?' বললেন, 'আগে বাইক স্টার্ট কর তারপর বলছি।' তিনি চেপে বসলেন যেতে যেতে বললেন, 'বাকি পাঁচ কাঠা আমাদের আদায় করতে হবে না?' এ কথা বলে বললেন, 'ডি সির অফিসে চল।' আমি অভিভূত হলাম।

দুপুর গড়িয়ে গেছে আগেই কিন্তু তিনি এই টেবিল ওই টেবিলে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। অনেক ফাইল ঘাঁটাঘাঁটির পর তিনি বললেন, 'দেখো কাণ্ড। ল্যান্ড এডভাইসরি কমিটিতে দশ কাঠার অনুমোদন থাকলেও এখান থেকে দিসপুরে আসাম সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে শুধু পাঁচ কাঠা। যাই হোক এবার দেখো আমি কী করে বাকি জায়গা আদায় করি।' তারপর আরও অনেক দৌড়ঝাঁপ করে সন্ধ্যাবেলা আমরা বাড়ি ফিরলাম। পরবর্তী দুদিনে আমাদের জমির তিনদিকের সীমানার বেড়া দেওয়ার কাজ সমাধা হল। পশ্চিম প্রান্তে জলের গভীরতা বেশি থাকায় সেদিকে সম্ভব হল না। কাছাড় জেলা ভবন নির্মাণ কমিটির এক সভা ৫ ডিসেম্বর ২০০৪ সন্ধ্যা ৬ টায়। কমিটির অন্যতম সদস্য অনন্ত দেব মহাশয়ের বাড়িতে সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সভায় কাছাড় জেলা প্রস্তাবিত ভবনের জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস এবং সম্পাদক প্রদীপ আচার্যের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সেই সঙ্গে এই জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব এবং আসামের মন্ত্রী গৌতম রায়কে চিঠি দিয়ে ধন্যবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিতব্য ২১তম অধিবেশনের আগেই কাছাড় জেলা ভবনের শিলান্যাস করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বঙ্গসাহিত্যের প্রস্তাবিত কার্যালয় ভবনের শিলান্যাস করার জন্য ক্রমশ চাপ বাড়তে লাগল। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ স্থানীয় দীননাথ নবকিশোর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান চলছে। অনন্ত দেব আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সবাই অরগেনাইজার হয় না, তাই বলেও লাভ নেই, তোমার কাছে প্রত্যাশা অনেক শিলান্যাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেল।'

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং বিশ্বাসদা দুজনেরই এ ব্যাপারে সহমত ছিল যে একবার যদি এই পাঁচ কাঠার উপর কাজ শুরু হয়ে যায় তাহলে হয়ত পরবর্তী পাঁচ কাঠার তাগিদটা হ্রাস পাবে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ পাঁচ কাঠা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং এতে আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কোনোটাই সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে না। অপেক্ষায় ছিলাম আমরা উপযুক্ত সময়ের এবং অবশেষে আমরা যখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের উদ্দেশ্য প্রায় সফল হতে যাচ্ছে তখনই শিলান্যাসের তারিখ নিয়ে ভাবতে বসলাম যদিও ইতিমধ্যে আরও একটা বছর প্রায় কেটে গেছে।

৩০-১০-০৫ নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাছাড় জেলা সমিতির এক বর্ধিত কার্যকরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগামী শীতের মরশুমের শুরুতেই যাতে কাছাড় জেলার প্রস্তাবিত ভবনের শিলান্যাস করা যায় তা সুনিশ্চিত করতে ৭ ডিসেম্বর ২০০৫ দিনটিকে ধার্য করা হয়। এবং দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৭ ডিসেম্বর ২০০৫ বুধবার বেলা ১২ টায় বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। ঐ দিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আসামের ভূমি রাজস্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রী গৌতম রায়। সম্মানিত অতিথি হিসাবে আসামের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও আইনমন্ত্রী দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা, সমবায় ও পর্যটন মন্ত্রী মিসবাহুল ইসলাম লস্কর, রাজ্যসভা সাংসদ কর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, বিধায়ক বিমলাংশু রায়, শিলচর পৌরসভার সভানেত্রী শ্রীমতী বীথিকা দেব এবং জেলা উপায়ুক্ত শ্রীমতী সুনন্দা সেনগুপ্তকে মঞ্চে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হবে। কাছাড় জেলা সমিতির সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিতব্য এই সভায় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন সম্পাদক প্রদীপ আচার্য, সভা সঞ্চালনায় থাকবেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। এছাড়াও শিলান্যাসের প্রস্তুতি অস্থায়ী মঞ্চ ও মিলনায়তন এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদির জন্য ভবন নির্মাণ সমিতির সদস্য শান্তনু দাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তহবিল সংগ্রহের জন্য চতুদর্শ অধিবেশনের উদ্বৃত্ত টাকা যা তৎকালীন অধিবেশন সম্পাদক সুজিৎ কুমার ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে, তা কাছাড় জেলা সমিতিকে হস্তান্তরের জন্য সুজিৎ কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

১৮-১১-০৫ সন্ধ্যা ৬ টায় এবং ২-১২-০৫ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে স্থানীয় রাধামাধব বালিকা বিদ্যালয়ে কাছাড় জেলা ভবন নির্মাণ কমিটির দুটো সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুটো সভাতেই মূলত শিলান্যাস অনুষ্ঠানের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। এরপর আসে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই দিন। ৭ ডিসেম্বর ২০০৫ ভবনের শিলান্যাসের অনুষ্ঠানে সন্তোষমোহন দেব তাঁর বক্তব্যে প্রস্তাবিত এই ভবনকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। গৌতম রায় মঞ্চে ঘোষণা করেন, 'আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমি প্রস্তাবিত ভবনের জন্য পাঁচলক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেব এবং সেইসঙ্গে আসাম সরকার থেকে বাকি জমিটুকুর ব্যবস্থাও করে দেব।' শিলচরের বিধায়ক বিমলাংশু রায় বললেন, 'আমি নিতান্তই বিরোধী দলের বিধায়ক। তবুও সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীর ভূমিকা পালন করে যাব।' জেলা উপায়ুক্ত সুনন্দা সেনগুপ্তের প্রতিনিধি হিসাবে, অতিরিক্ত জেলা উপায়ুক্ত বহ্নিশিখা দত্ত জেলা প্রশাসন থেকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রবীণ সদস্য/সদস্যা অনেকেই স্মৃতি মেদুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

৯ ডিসেম্বর ২০০৫ মন্ত্রী গৌতম রায়ের প্রতিনিধি মৃদুল মজুমদার আমাকে দূরভাষে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বললেন 'মন্ত্রী মহোদয় শিলান্যাস অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি মাফিক পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনি বাড়ি আছেন তো আমি টাকাগুলো নিয়ে আসছি।' আমি তাৎক্ষণিকভাবে বাকরুদ্ধ হলাম তারপর বিহ্বলতা কাটিয়ে বললাম আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিন এমন একটা শুভ মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য আমি বিশেষ করে ভবন নির্মাণ সমিতির সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাতে চাই। দূরভাষে প্রথমেই এই শুভ সংবাদটা জেলা সভাপতিকে জানালাম এরপর একে একে অনন্ত দেব, মৃণালকান্তি দত্তবিশ্বাস, সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, শান্তনু দাস, তৈমুর রাজা চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সমীর কুমার দাস আদি সবাইকে দূরভাষ মারফৎ সুসংবাদটা দেওয়া হল। এরপর শ্রী মজুমদার আমার জয়গুরু লেন, বিলপারের বাড়িতে এসে কাছাড় জেলা ভবন নির্মাণ সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসের হাতে মন্ত্রী গৌতম রায়ের পাঠানো নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে দেন। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব যে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারই সূত্র ধরে বরাক বঙ্গের এক প্রতিনিধি দল শ্রী দেবের বাড়িতে গিয়ে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, তৈমুর রাজা চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, বিনোদ বিহারী দেবনাথ, প্রসূন কান্তি দেব এবং আমি। প্রস্তাবিত ভবনের আনুমানিক ব্যয়ের রাশি

শুনে তিনি পাঁচ লক্ষ করে দু দফায় দশ লক্ষ টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেন। দুদিন পর আমি ও সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে উপস্থিত হলে মন্ত্রী প্রতিনিধি বাদল দে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা আমাদের হাতে তুলে দেন। ১৩ আগস্ট ২০০৫ মন্ত্রীর আহ্বানে কাছাড়ের উপায়ুক্ত গৌতম গাঙ্গুলি জেলা সমিতির অস্থায়ী কার্যালয়ে উপস্থিত হলে নির্মীয়মান ভবনের সামনের দিকে সরকারি আবাসনগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে উক্ত ভূখণ্ড সম্মেলনকে দেওয়ার জন্য বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

১ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আঁশিয়ার সভানেত্রী সুস্মিতা দেব, সম্পাদক শান্তনু চৌধুরী এবং সদস্য বিকাশ দেব সম্মেলনের অস্থায়ী কার্যালয়ে এসে ভবন নির্মাণের জন্য তাঁদের সংস্থার পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসের হাতে তুলে দেন।

৭ এপ্রিল ২০০৮ সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আমরা বিধায়ক কুতুব আহমেদ মজুমদারের বাদ্রিপারের বাসভবনে উপস্থিত হলে ভবন নির্মাণের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদানের প্রথম অংশ হিসাবে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দেন জেলা সমিতির প্রতিনিধি দলের হাতে।

বঙ্গভবনের প্রথম দফার নির্মাণকার্য প্রায় শেষের দিকে এগোচ্ছিল কিন্তু তখনও আরো কিছু টাকার প্রয়োজন এদিকে তহবিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। এই অবস্থায় আবার মন্ত্রী গৌতম রায়ের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানানো হলে ১২ মে ২০০৮ পরিদর্শনে এসে আরও একলক্ষ টাকা দান করেন। ৯ জুন ২০০৮ দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ভবন নির্মাণ কমিটির সভায় জেলা সমিতির নির্মিয়মান ভবনের প্রথম পর্যায়ের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩ আগস্ট, ২০০৮ বহুকাঙ্ক্ষিত সেই দিনে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব এবং আসামের মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায় কর্তৃক বঙ্গভবনের দ্বারোদ্ঘাটন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

বঙ্গভবনের প্রথম পর্ব শেষ হল, কিন্তু ভবনকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বাস্তুকার প্রণব কুমার দাস এবং প্রদীপ আচার্য মিলে ফ্রন্ট এলিভেশন সহ এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকার এক প্রকল্প তৈরি করলেন এতে মন্ত্রী গৌতম রায় অনুমোদন জানালে তা মন্ত্রী মহোদয় মারফৎ আর্থিক সহায়তার জন্য আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সমীপে প্রেরণ করা হল।

কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, অনুরূপা বিশ্বাস, ছবি গুপ্তা আরও অনেকেই এমন একটা দিন চাক্ষুষ করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় সবাই সিমেন্ট-বালি-পাথরের মিশেল ভিত্তি প্রস্তরের স্তম্ভে ঢালেন। এর পরবর্তী সবই ইতিহাস। প্রথম পর্যায়ের ওই উদ্বোধনীর মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল আগামীর স্বপ্ন। আপাতত অলোচনাকে আর বিস্তৃত করার অবকাশ নেই। তাই এখানেই ইতি টানতে হবে। তবে পরিশেষে বলতে চাই এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মেলনের প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রসুনকান্তি দেব, অনুরূপা বিশ্বাস এবং অনন্ত দেবের অনুপ্রেরণায় এবং বিশেষ করে সৌরিন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, তৈমুর রাজা চৌধুরী, সুজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, সমীর কুমার দাস, শান্তনু দাস, বিনোদ বিহারী দেবনাথ, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, সন্তোষ কুমার গুপ্ত, শ্যামল কান্তি দেব, বিভাসরঞ্জন চৌধুরী, সুজন দত্ত, মৃদুল মজুমদার, অনিল পাল, সঞ্জীব দেবলস্কর, দীপক সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এদের কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পেয়েছি তা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে। আর জেলা সমিতির সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস-মহাশয়ের কর্মতৎপরতা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই।

# সম্প্রসারিত বঙ্গভবন

দিনের আলোয় বঙ্গভবন

বঙ্গভবন নামফলক

কোন পথে, কোথায়, কখন, কী

মহাসংগ্রামের মহাফেজ

শিল্প প্রদর্শনী কক্ষ 'দৃষ্টিনন্দন'

ভাষা শহিদ স্মৃতিমঞ্চ

বৌদ্ধিক মিলনায়তন

শেফালিকা রায় স্মৃতি প্রেক্ষাগৃহ, শ্রুতিনন্দন

# স্বপ্ন যখন সত্যি হয়...

## তৈমুর রাজা চৌধুরী

হাঁটছিলাম। প্রতিদিনের রুটিনমাফিক সান্ধ্য ভ্রমণ। সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে চারপাশে। সদরঘাট বিবেকানন্দ মূর্তি পেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিতেই চোখ আটকে গেল। আলোয় ঝলমল করছে কয়েকটি অক্ষর-'বঙ্গভবন'। লাল, হলুদ, সবুজ, নীলচে আভায় সদ্য আলোকস্নাত এক সুউচ্চ, সুদৃশ্য ইমারত অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে গিয়ে বাখান করছে কীসের গৌরব গাঁথা! থমকে দাঁড়ালাম। বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। এটাই আমাদের স্বপ্নসৌধ। এর স্রষ্টা আমরা! এখনও ভাবতে যেন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চ অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু অকল্পনীয় কল্পনারই তো মূর্ত রূপ চোখের সামনে আলোর সঙ্গে মায়াবী খেলায় মত্ত। কয়েক যুগের সঞ্চিত স্বপ্ন, পুঞ্জিত অভিমানের মূর্তমান প্রতিবিম্বের সামনেই তো দাঁড়িয়ে আমি। এতো শুধু ইমারত নয়, বরাকের বাঙালির শিল্প সংস্কৃতির একটা স্থায়ী সাকিন, এ অঞ্চলের বহু ভাষাভাষী, বর্ণগোষ্ঠীর সমন্বয়ের সাজানো মঞ্চ। মনে পড়ছিল এই সেদিনের সে এঁদো পুকুর, তার মধ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। একের পর এক ইটের গাঁথুনি বিশাল ইমারতের রূপ নিয়েছে। এর নির্মাণকাজে এতটাই জড়িয়েছিলাম যে তা খেয়াল করার অবকাশই যেন ঘটেনি। ভাবতেই এখন মনে পুলক লাগছে।

হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে গেল কত কথা। বঙ্গভবনের গোড়ার কথাগুলোও স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে লাগল। ছিলাম বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের একজন সাধারণ সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও বটে। পরে বিভিন্ন পদেও দায়িত্ব নির্বাহ করেছি। মনের কোণে সব সময়ই একটা পুরনো ব্যথা চাগাড় দিয়ে খানিকটা বিব্রত করত। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে ভারতবর্ষের একটা মিনি সংস্করণ এই বরাক উপত্যকা— এখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীরই নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চার নিজস্ব পরিসরে নিজস্ব স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে অথচ বরাকের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির এ ক্ষেত্রে নিজের বলে কিছুই নেই। ভাবতাম এ অঞ্চলের বাঙালিরও একটা স্থায়ী ঠিকানা যদি হত, সেখানে শিল্প সংস্কৃতির চর্চা, প্রচার-প্রসার, ঐতিহ্যকে ধরে রাখার মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ একজোট হয়ে কাজ করবেন। যে ঠিকানা বাঙালির উদ্যোগে হয়েও আখেরে বরাকের বহুভাষিক শিল্প, সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে; যে ঠিকানা সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে এ অঞ্চলের সর্বজাতি, সর্বভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতির রক্ষক, পৃষ্ঠপোষক এবং পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নেবে। আমার মতো সমমনোভাবাপন্ন অনেক মানুষই ছিলেন। অবশেষে স্বপ্নের জাল বুনোনের প্রথম গ্রন্থিটা বাঁধা হল।

১৯৯১ সাল। শিলচরে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের আয়োজন হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন সরোজকুমার দাস, অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক, আমি নিজে ছিলাম সহকারী সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন অনন্ত দেব। অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরীর সহধর্মিণী অনিমা চৌধুরী তখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই বিমর্ষ বিজিৎদা সাধারণ

সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন। আমিই তাঁকে বললাম, ওই পদে আপনার থাকার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে, আপনি থাকুন। আপনার হয়ে পরোক্ষে আমি সব দিক সামলানোর দায়িত্ব নেব। অগত্যা তিনি রাজি হলেন। একাদশ অধিবেশন বেশ সাড়া জাগিয়েই সমাপ্তির পথে এগোেল। একাদশ অধিবেশন বিশেষ একটা কারণে বঙ্গসাহিত্যের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওই অনুষ্ঠান শেষে আমরা প্রথমবার একটা ভাল পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত হিসেবে আমাদের কোষাগারে দেখতে পেলাম। উচ্ছ্বসিত অনন্তদা তখন আমাদের অনেককে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। বিজিৎ চৌধুরী, শান্তনু দাস, বর্তমানে বিজেপি নেতা অজিত ভট্টাচার্য সহ সম্মেলনের সক্রিয় পদাধিকারীরা অনন্তদার বাড়িতে হাজির হলাম। অনেক হইচই হল। তখন অনন্তদাই প্রথম প্রস্তাবটা রাখলেন-যাযাবর জীবন তো অনেক বছর কাটাল বঙ্গসাহিত্য; চল এবার চেষ্টা করা যাক না একটা স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করা যায় কিনা। সবাই একবাক্যে সায় জানালাম। কিন্তু জায়গা পাব কোথায়? আরও কয়েক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনেও আরও কিছু উদ্বৃত্ত অর্থের মুখ আমরা দেখলাম। সুজিৎকুমার ভট্টাচার্য তখন সাধারণ সম্পাদক।

এদিকে, তখন সন্তোষমোহন দেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, জাতীয় পরিচিতি নিয়ে দাপটের সঙ্গে মন্ত্রিত্ব সামলাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী গৌতম রায়। আমরা এবার তাঁদের দ্বারস্থ হলাম। মূলত তাঁদের বদান্যতায় আমরা সদরঘাট বাসস্ট্যান্ডের পাশে সামান্য জমিও পেলাম। সেখানে ২০০৫ সালের ৭ ডিসেম্বর ঘর নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। ছোট্ট একটা পাকা ঘরও নির্মিত হল। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির প্রথম নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই হল। এই জায়গা পেতে প্রশাসনিক সাহায্য কোনওদিন ভোলার নয়। ২০০৮ সালের ৩ আগস্ট সম্মেলনের নবনির্মিত কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব এবং মন্ত্রী গৌতম রায় মিলেই। জেলা সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, সম্পাদক প্রদীপ আচার্য এবং সক্রিয় সদস্য শান্তনু দাস এতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস সহ অন্যান্যদের নিষ্ঠা এবং দায়বদ্ধতার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ছোট্ট ভবনটির নির্মাণের প্রাথমিক কাজটা হয়েছিল সম্মেলনের কোষাগারের জমানো অর্থ থেকেই। কারণ প্রথমবারের উদ্বৃত্ত অর্থ এতদিনে সুদেমূলে বেড়ে হয়েছে প্রায় এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা এবং তার সঙ্গে যোগ হল চতুর্দশ অধিবেশনে উদ্বৃত্ত ৫০ হাজার টাকা। তারপর এ কাজে এগিয়ে আসেন সন্তোষমোহন দেব, গৌতম রায় এবং শ্রীমতী সুস্মিতা দেব। এক্ষেত্রে গৌতমবাবু ৬ লক্ষ, সন্তোষবাবু ৫ লক্ষ এবং সুস্মিতা দেব (বর্তমান সাংসদ) তাঁর আঁশিয়া সংগঠন থেকে ৫ লক্ষ টাকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। এদিকে, সেই সময়ের বিধায়ক কুতুব আহমদ মজুমদারও ২৫ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এই ছোট্ট ভবনটির নির্মাণের ক্ষেত্রে কারিগরি পরামর্শদানে বিরাট সাহায্য করেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার পি কে দাস।

আমাদের খুশি আর বাঁধ মানছিল না। বিরাট তৃপ্তি ছেয়েছিল মনে। কিন্তু সেই তৃপ্তির ভিতে আবার এক অতৃপ্তির জন্ম হল। আমরা ভাবতে লাগলাম যদি আমাদের একটা ভবন হত যেখানে থাকবে অত্যাধুনিক প্রেক্ষাগৃহ, আর্ট গ্যালারি, ভাষা শহিদের স্মৃতি রক্ষা তথা ভাষা আন্দোলনের দলিল সংরক্ষণের জন্য কক্ষ, বরাকের শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাসসমৃদ্ধ মিউজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে কী ভাল হত। বরাক উপত্যকায় একটা সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠত সেটা। সেই থেকে আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম একটা পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবনের। কিন্তু তার জন্য চাই একটা বিশাল পরিসর। এত বড় জায়গা কীভাবে ম্যানেজ হবে, এটা একটা বিরাট ভাবনা ছিল।

এই ভাবনার সূত্রে মনে হল ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখাই যাক না প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বরা কীভাবে গড়ে তুলেছিলেন সারস্বত সাধনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। প্রথমেই মনে পড়ল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর কথা। তথ্য ঘেঁটে

দেখলাম, ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ বৈশাখ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ছয় বছর পর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিষদ-এর নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। পরিষদ-এর জমি কেনার সামর্থ ছিল না। তাই চারুচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নগেন্দ্রনাথ বসু এই পাঁচজন কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে দেখা করে পরিষৎ-এর নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য জমি প্রার্থনা করেন। ১৯০১ খ্রিঃ ২০ আগস্ট মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষৎ-এর ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমিদান করেন। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিল। নক্শা অনুযায়ী দ্বিতল ভবন নির্মাণের অর্থ নেই। এ ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন লালগোলা নিবাসী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর। দ্বিতল নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয় ১০, ০৫৮ টাকা এককভাবে দান করলেন যোগেন্দ্রনারায়ণ। একতলায় গ্রন্থাগারের বইপত্র যাতে নষ্ট না হয় এজন্য নিজ খরচে নিম্নতল মর্মর মণ্ডিত করে দেন মুর্শিদাবাদের রায় শ্রীনাথ পাল। এই তিন মহৎ পুরুষের দানে নির্মিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনের উদ্বোধন হয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ। একশো ছয় বছর পর নির্মিত প্রান্তীয় অঞ্চলের এই ভবন কি সেই উচ্চতায় পৌঁছবে? উত্তর প্রজন্মের কাছে প্রত্যাশা রাখছি। আমি তৃপ্ত। কারণ দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আজ বাস্তব হয়েছে। আসামের মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন বলেই এই ভবন নির্মিত হয়েছে। তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। এই আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে আমি স্মরণ করছি আমাদের চিরকালীন আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কথা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনের প্রতিষ্ঠা উৎসবের অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের এই সাহিত্য পরিষৎ এতদিন গর্ভবাসে ছিল। সে অল্পে অল্পে রসে-রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার সুহৃদগণ তাহাকে নানা আঘাত অপঘাত হইতে সযত্নে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। তাহার দশমাস কাটিয়ে গিয়াছে- আজ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। ধর্ম্মসাধনের গোড়াতেই শরীরের প্রয়োজন হয়। সাহিত্য পরিষদের সেই আদ্য প্রয়োজন আজ সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন হইতে তাহার ধর্মসাধনা সবলে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে এইরূপ আশা করা যাইতেছে।'

আমাদেরও আশা, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন আজ থেকে অনেক বেশি গতিশীল হবে। পূর্বসূরিদের কল্পনা বাস্তব রূপ লাভ করবে।

আমাদের ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুশকিল আসান করে দিলেন মন্ত্রী গৌতম রায়। তিনি আমাদের পুরনো ভবন সংলগ্ন বিশাল সরকারি জমি পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এমনকী ওই জায়গার সামনের দিকে কিছু সরকারি কোয়ার্টার ছিল তাঁর উদ্যোগেই সেগুলো অন্যত্র স্থানান্তরিত হল। সম্পত্তি তো হল কিন্তু এই এতবড় জমি বেদখল হবার ভয়, নিরাপত্তার উদ্বেগ একটা রয়ে গেল। শুনে বর্তমান বঙ্গভবনের পুরো সীমানা দেওয়াল করিয়ে দিলেন মন্ত্রী গৌতম রায়। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

২০১১ সালের ১৬ জানুয়ারি বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির সভাপতি হলাম আমি এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন দীপক সেনগুপ্ত। যদিও দু-বছর সহ-সভাপতি পদে ছিলাম, সভাপতি পদে এই প্রথম। আমরা পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবনের স্বপ্ন নিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগোতে শুরু করলাম। জানতাম কাজটা কঠিন। এরমধ্যে এসে গেল বিধানসভা নির্বাচন। ২০১১-র রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জিতলেন শিলচর থেকে শ্রীমতী সুস্মিতা দেব এবং কাটলিছড়া থেকে গৌতম রায়। দু'জনেই আমাদের সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের আমরা ওই বছরের ২৬ জুন বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ করলাম। স্মারক হিসেবে দুটো বেগবান ঘোড়া তাঁদের হাতে তুলে দিলাম। স্মারকটি খুবই অর্থবহ ছিল দু'জনের পক্ষে। সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললাম 'আপনারা বেগবান অশ্বের মতো আসামের রাজনৈতিক তেপান্তরে ছুটছেন। সব বাধা বিপত্তি গুঁড়িয়ে আপনারা এগিয়ে যান।

আশা রাখি, বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রেও আপনাদের সদর্থক ভূমিকা থাকবে।'

ইতিমধ্যে আবেগিক সূত্রে বরাকবঙ্গের সঙ্গে অটুট বন্ধনে বাঁধা পড়লেন মন্ত্রী গৌতম রায়। তিনি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গেই সেদিন প্রতিশ্রুতি দিলেন সবার সাহায্য সহযোগিতায় পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবনের স্বপ্ন তিনি সফল করবেন। কারণ এ স্বপ্ন তাঁর নিজেরও স্বপ্ন। ব্যাস, আর কাল বিলম্ব নয়। মন্ত্রীর নিরন্তর তাগাদার প্রেক্ষিতে ২০১১-র ১৫ আগস্টই শিলান্যাস হয়ে গেল পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবনের। কাজ শুরু হল ওই বছরেরই ২ ডিসেম্বর। এদিকে, ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি আমি এবং দীপক সেনগুপ্ত পুনর্বার নির্বাচিত হই সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে। ভবন নির্মাণের কাজ চলতে থাকল। এরপর যা হল সেটা একটা ইতিহাস। বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এক উজ্জ্বল গাঁথা রচিত হল। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই সম্প্রসারিত বঙ্গভবন সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াল চোখ ধাঁধানো রূপ নিয়ে। পর্যাপ্ত অর্থ ভাণ্ডার নিয়েও অন্য কোনও জায়গায় এত বৃহৎ প্রকল্প এত দ্রুততায় ক'টা সম্পূর্ণ হয়েছে, আমার জানা নেই। জানি না, কীভাবে যে এসব হল। লক্ষ্য করলাম, স্বপ্ন দেখছিলাম আমরা, কিন্তু আমাদের স্বপ্ন যে কখন এ অঞ্চলের অগুনতি মানুষের স্বপ্ন হয়ে উঠল টেরই পেলাম না। সংস্কৃতিজীবী, বুদ্ধিজীবী বাছবিচার নেই যে যেমন পারলেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। সদস্যরা চাঁদা দিলেন, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কত মানুষ যে সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করলেন তাঁদের নাম বলে শেষ করা যাবে না। তবে অর্থ জোগানের মূল উৎস ছিলেন মন্ত্রী গৌতম রায়-ই। এই প্রকল্পে কোনও রাজনীতি নয়, আগপাছ না ভেবেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাশাপাশি, কিছু নামোল্লেখ না করলেই চলে না যাঁদের সম্মেলনের সঙ্গে যোগ থাকার কথাই ছিল না। তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে রাজ্যসভার সাংসদ শ্রীমতী নাজনিন ফারুকি দিলেন ৫০ লক্ষ টাকা, সাংসদ পঙ্কজ বরা ৭০ লক্ষ টাকা, মন্ত্রী রকিবুল হোসেন দিলেন ৫ লক্ষ টাকা। বরাকের চা-শিল্প মহল থেকে এসেছে ৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা, শিলচরের তদানীন্তন সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ প্রথম দফায় ৫ লক্ষ টাকা দিলেন এবং দ্বিতীয় দফায় ১৮০ কেভির জেনারেটর সেট কেনার জন্য দিয়েছেন আরও ১৩ লক্ষ টাকা। শিলচর ফুড গ্রেইন্স মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন দিয়েছে ২ লক্ষ, মন্ত্রী অজিত সিং দিয়েছেন ১ লক্ষ টাকা। এছাড়া আসাম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা দফতর থেকে পেয়েছি ১ কোটি টাকা। অবশেষে প্রায় ৬.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল আমাদের স্বপ্নের সম্প্রসারিত বঙ্গভবন। কয়েকজন সদস্যের অল্পকিছু দান ও কবীন্দ্রবাবুর মঞ্জুর করা অর্থ ছাড়া বাকি সমস্ত দান এবং অবশিষ্টাংশ অর্থের ব্যবস্থাপনার মূল ভূমিকায় ছিলেন মন্ত্রী গৌতম রায়। অর্থ সাহায্য ছাড়াও বঙ্গভবনের রূপায়ণে প্রাণপাত শ্রম করেছেন অনেকেই। সব কাজ ভুলে বঙ্গভবনের কাজের তদারকিতে নামলেন নির্মাণ উপ-সমিতির কার্যকরী সভাপতি সুজন দত্ত, প্রকৌশলী আশিস কুমার গুপ্ত ও চন্দন শর্মা। অত্যন্ত কর্মঠ এবং বিচক্ষণ রাজমিস্ত্রি রঞ্জিৎ দাস বঙ্গভবনে দিনরাত যাপন করে সুক্ষভাবে কাজ করেছেন।

একটা পুকুর ভরাট করে তৈরি করা এই ভবন নির্মাণে পাইলিঙের কাজে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেন গৌতম কন্সট্রাকশনের বিনোদ সিঙ্গি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন হাইলাকান্দির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাদল পাল। প্রাথমিক স্তরে প্রকল্পের কারিগরি দিক দেখাশোনা করেছেন মহীতোষ (আশু) পাল, বিশ্বদীপ চক্রবর্তী, অরূপ রায়, অসীম দে-র মতো মানুষ। নান্দনিক বিষয় নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পী সুজিৎ পাল, নির্মলকান্তি রায়, গণেশ নন্দী, সমিত রায়রা। ভবনের অভ্যন্তরীণ সজ্জার কাজটা দেখাশোনা করেছেন দীপঙ্কর দেব। নানাভাবে সাহায্য করেছেন মৃদুল মজুমদারও। আরও কত মানুষ যে কত ভাবে অবদান রেখেছেন বলে শেষ করা যাবে না। বিনা শুল্কে

এবং স্বল্প সময়ে ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে সহযোগিতার জন্য শিলচর পৌরসভাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনও উপযুক্ত ভাষা আমার সঞ্চয়ে নেই।

অগুনতি মানুষের আবেগ, কায়িক, মানসিক, আন্তরিক শ্রমের পুঞ্জীভূত রূপ আমার সামনে অপার সৌন্দর্য ও অহঙ্কারের অভিব্যক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে। কী নেই এতে! ৬০০ আসন ক্ষমতাসম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ। অত্যাধুনিক সাউন্ড, আলো, মঞ্চ ও কারিগরি বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুসজ্জিত। আছে ১০০ আসনের সুদৃশ্য মিনি কনফারেন্স হল। আছে প্রমাণ সাইজের আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম, সুরম্য অতিথিকক্ষ। বরাকের ভাষা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিতে থাকবে একটা কক্ষ যেখানে ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস, ভাষা সেনানীদের টুকরো টুকরো স্মৃতি, নথিপত্র সব সংরক্ষণ করা হবে। এনিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহীরা যাতে এখান থেকে মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন তার জন্য যত্নশীল থাকবে সম্মেলন। ভবনের সামনে প্রাঙ্গণে থাকবে শহিদ মিনার। ভবনের দেয়ালগাত্রে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিশাল ফাইবার ম্যুরাল থাকছে। পাশাপাশি বরাকের ভূ-প্রকৃতি, ঐতিহাসিক সৌধ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরম্পরাও ম্যুরালে স্থান পাবে। ভবনের সামনে থাকছে শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ সংস্কারে বিশ্ববরেণ্য বাঙালি মনীষীদের প্রতিকৃতি এবং ভবনের ভিতরের দেয়ালে থাকবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাককে পথ দেখানো স্থানীয় কৃতবিদ্যদের প্রতিকৃতি। সব মিলিয়ে বহুত্বের একটা নিরেট রূপ আমাদের সম্প্রসারিত বঙ্গভবন। আজ পিছন ফিরে চেয়ে ভাবি কীভাবে আমরা পারলাম এত বড় কাজটা করতে? পেরেছি আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস, নিষ্ঠা ও ভালবাসার জোরে। আজ খুব বেশি করে মনে পড়ছে একটা কথা, দেশের প্রথমসারির শিল্প সমালোচক তথা বরাকের সু-সন্তান শোভন সোম একদিন বলেছিলেন, 'স্বপ্নকে কখনও ছোট করো না। স্বপ্ন ছোট হলে সামনের রাস্তাটাও ছোট হয়ে যায়।' সত্যি, আমরা আমাদের সাধ্যের তুলনায় একটু বড়ই স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু দেখেছিলাম বলেই পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবন মাথা তুলতে পারল। নাহলে কী হত জানি না। এ সমস্ত কিছুর জন্য মন্ত্রী গৌতম রায় সহ যারাই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন তাদের আবারও অশেষ ধন্যবাদ। তবে এটাও ঠিক, একটা স্বপ্ন ভূমিষ্ঠ হল বাস্তবের রং মেখে। এখন সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা, যথাযথ লালন-পালন করা এবং বিকাশের পথে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা হবে আরও কঠিন কাজ। আমাদের সবাইকেই সে কাজে ব্রতী হতে হবে। কারণ বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের দায়িত্ব যে অনেক। চিরঅভাগী বরাকের সর্বভাষা, সর্বসংস্কৃতির মহামূল্য রতনমণি এই বঙ্গভবন। এতদিনের অবহেলা, বঞ্চনা, আগ্রাসনের নিকষ কালোকে বিদীর্ণ করে আলোর পথ দেখাতে হবে তাকেই। চল্লিশ লক্ষ বরাকবাসীর অভিভাবক হতে হবে তাকে। আর আমরাও এভাবে স্বপ্নের জাল বুনে যাব। সম্প্রসারিত বঙ্গভবনের স্বপ্ন সাফল্য আমাদের জুগিয়ে যাবে নতুন স্বপ্ন দেখার সাহস। নিরন্তর, নিশিদিন।

# বঙ্গভবন নির্মাণ ও কিছুকথা

## সুজন দত্ত

২০১১ সালের ১৫ আগস্ট। এদিনই শিলচর শহরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় ১৬ আনা বাঙালিয়ানা ও বরাকের ৪০ লক্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের গর্বের বঙ্গভবনের। সেদিন ভবনের শিলান্যাস করেন মন্ত্রী গৌতম রায়। তিনিই আমাকে দায়িত্ব সঁপে দেন পূর্ণাঙ্গ এই ভবন নির্মাণ কমিটির কার্যকরী সভাপতির। শিলচর ডেভলাপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান হিসেবেই আমাকে এতবড় দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়। গোড়াতেই মন্ত্রী রায় আমাকে বলেন, "সুজন কাজ সুন্দর হওয়া চাই। এই ভবন আমাদের সবার গর্ব। একাদশ ভাষা শহিদের রক্ত স্নাত শহরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এই ভবন। এর জন্য যা টাকা খরচ হয় হোক্। কিছুতেই পিছু হঠলে চলবে না। 'আমি- আছি'-এ কথা মনে রাখবে।"

ব্যস, শুরু হল 'মহাযজ্ঞের' প্রস্তুতি। ২০১১ সালের ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল কাজ। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পেলেন আশিস গুপ্ত। রাজমিস্ত্রি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় পালংঘাটের রঞ্জিত দাসকে। গড়ে ওঠে ইমারতের ভিত। কাজের তদারকির দায়িত্ব পান শিলচর ডি এস এ'র গ্রাউন্ড সচিব চন্দন শর্মা। দিনে-রাতে চলে পরিশ্রম। এ দিকে খরচও বেড়ে চলে পাল্লা দিয়ে। টাকা কেমন করে খরচ হয় তা বোঝাই যায় না। কারণ জিনিসের দাম বাড়ে, কমে না। কিন্তু ভাল কাজে টাকার অভাব হয় না। টাকার অভাবে বন্ধ হয়নি কাজ এক দিনের জন্যও। যখনই টাকার অভাব হয়েছে, তখনই এগিয়ে এসেছেন মন্ত্রী। বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে দিয়েছেন অর্থ। সদিচ্ছা থাকলে যে টাকার জন্য আটকায় না কোনও কাজ, তার প্রমাণ দিয়েছেন মন্ত্রী গৌতম রায়। এই কাজে টাকা দিয়েছেন শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, মন্ত্রী অজিত সিং, রকিবুল হোসেন। মানসিকভাবে সাহস দিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবও। এছাড়াও রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগও সাহায্যের হাত বাড়ায়। সাহায্য করেন টাই ও আইটিএ কর্তারাও। সাহায্য পেয়েছি বণিক সংস্থাগুলোরও।

সমস্যা হয় বনজ সম্পদ অর্থাৎ বালু ও পাথর নিয়েও। কারণ ওই সময় সুপ্রিম কোর্টের আদেশে বন্ধ ছিল বালু ও পাথর তোলা। কিন্তু সবার সাহায্য ও সহযোগিতায় সে বাধাও পেরিয়ে যাই আমরা। আটকায়নি কিছুই। কাছাড়ের জেলা প্রশাসন এই ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে এমন সব সাহায্য করেছে যা ভোলার নয়। বিভিন্ন সময়ে বহু বাঁধা কেটে যার প্রশাসনের হস্তক্ষেপে। পাশাপাশি কাছাড় পুলিশও আমাদের সাহায্য করে। বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশ যে ভূমিকা পালন করে ওই সময় তা এক কথায় অনবদ্য। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ বিদ্যুৎ দপ্তর সহ আরও অনেকের কাছেই। তাছাড়া নির্মাণ শ্রমিকরাও আমাদের কথায় অনেক কাজ করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ পুরসভা এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কাছেও। কৃতজ্ঞ পূর্ত বিভাগের কাছেও। বঙ্গসাহিত্যের কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরীর কথা বলতে হয়। তিনি আবার ভবন নির্মাণ

কমিটিরও সভাপতি। যখনই আমার কোনও সমস্যা হয়েছে, তখনই তাঁকে জানিয়েছি। পেয়েছি পরামর্শ ও সাহায্য। আর দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসের মত সিনিয়র সিটিজেনরাও কম নন। ভবন নির্মাণ চলার সময় প্রায়ই আসতেন তিনি। তদারক করতেন কাজের। কার্যত শিলচরে বঙ্গভবন নির্মাণের মূল প্রস্তাবকও ছিলেন তিনি। এটা তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত। এই বয়সেও তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, কাজে উৎসাহ দিতেন শ্রমিকদের। এসব কথা জীবনে ভোলার নয়। বরং স্মৃতির মণিকোঠায় অমলিনভাবে খোদাই করা থাকবে এসব স্মৃতি।

কাল কারও জন্য অপেক্ষা করে না। আমরা কেউই অমর নই। এই বঙ্গভবন কিন্তু থাকবে। অন্তত যতদিন বাঙালি থাকবে ততদিন টিকে থাকবে এই ভবন। হয়ত নতুন করে সাজানো হবে অন্য কারও উদ্যোগে। আমরা সবাই কালের যাত্রী। একদিন চলে যাব জীবনের পরপারে। কিন্তু একটা বড় শান্তনা থাকবে সেটা হল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে গেলাম বঙ্গভবন। ১৬ আনা বাঙালিয়ানার ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য যোগ্য উত্তরসূরি বেরিয়ে আসুক, এটাই আমাদের কামনা।

# সম্প্রসারিত বঙ্গভবন

ইঞ্জিনিয়ার, তদারককারী, হেড মিস্ত্রির সঙ্গে সম্মেলনের কর্মকর্তারা

সন্তোষমোহন দেব, গৌতম রায়, হরেন্দ্রকুমার দেবমহন্ত এবং সম্মেলনের কর্মকর্তারা

মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, গৌতম রায়, রকিবুল হোসেন, অজিত সিং এবং কর্ণেন্দু ভট্টাচার্য

ভবন পরিদর্শনে হিমন্তবিশ্ব শর্মা

শুভেচ্ছা বিনিময়

প্রীতি উপহার রূপকারকে

বঙ্গভবনে সুস্মিতা দেব, ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য

কর্ম পরিদর্শনে মন্দিরা রায়

# বঙ্গভবন নির্মাণে আমার অভিজ্ঞতা

## চন্দন শর্মা

'বঙ্গভবন' নির্মাণ কর্মে একজন সহযোগী হিসেবে আমি কাজ করেছি। এ সুবাদে 'স্মরণিকা' সম্পাদক আমাকে কয়েকটি কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। সত্যি কথা বলতে, এ 'ভবন নির্মাণ' কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন সব অভিজ্ঞতা এল। আমি ভিন্ন ধরনের মানুষজনের সঙ্গী হয়ে উঠলাম, যাদের সঙ্গে এমনিতে হয়তো আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগ হত না। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীত জগতের মানুষদের সহযোগী হয়ে উঠলাম আমিও।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল এক সকালে। আমি তখন প্রাতরাশ করছিলাম। ফোন এল মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায়ের 'চন্দন যেখানেই থাকো, চলে এসো'। আমি বললাম, 'আসছি, তবে কেন?' মন্ত্রী বললেন, 'বঙ্গভবন বানাতে হবে। তোমার উপর কিছু দায়িত্ব পড়বে। অনেক বড় ব্যাপার'। আমি ভাবলাম কী আবার নতুন হুজোগ! আসলে আমার তো কোন ধারণাই ছিল না 'বঙ্গভবন' বা বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কে। যা'ই হোক, যখন বঙ্গভবনে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম একটা মোটামুটি ভবন আছে। কিন্তু যেদিকে ভবনটির সম্প্রসারণ হবে এদিকে তো এক পঁচা ডোবা, কোন রাস্তাও নেই। এ জায়গায় কী করে নতুন দালান তৈরি হবে বুঝতে পারছি না। মন্ত্রী বললেন, 'কাজে লাগো। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।' সেই হল শুরু, আর আজ ১০০৪ দিন পর সত্যিই এখানে দাঁড়িয়ে আছে এক অপূর্ব দালান। বরাক উপত্যকার গর্ব, আমাদের সবার 'বঙ্গভবন'।

আমার ছাত্রজীবন কেটেছে খেলার মাঠে। খেলাধুলাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকে জড়িয়ে পড়ি ক্রীড়াসংগঠনে। সেই সূত্রে স্নেহ ভালবাসা পাই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের। কাজ করার প্রেরণা পাই মণি কর্মকার মহাশয়ের কাছে, তিনি হাতে ধরে কাজ করিয়েছেন তাই হয়তো কাজের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। তাই হয়তো আমার উপর নজর পড়ে শ্রদ্ধেয় বাবুল হোড়, সুজন সত্ত, আশীষ গুপ্তদের। তারাই আমাকে কাজ করার দায়িত্ব দেন।

২ ডিসেম্বর ২০১১ শুক্রবার শুরু হয় আমার নতুন কাজ। প্রথমে জয়গা পরিষ্কার করে মাপজোখ নিয়ে শুরু হয় পাইলিং তৈরির কাজ। পেছনের পুষ্করিণী পরিষ্কার করে তাতে মাটি ভরাট করে পিলার ঢালাই করা চলতে থাকে।

ইট, বালু, পাথর, রড আসতে থাকে, দলে দলে কাজের লোক আসতে থাকে, এ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। চারিদিকে শুধু কাজ আর কাজ, কাজের পরিধি বাড়তে থাকে দায়িত্বও বাড়তে থাকে। ইজিনিয়ার আশীষ গুপ্তের নির্দেশ আর সুজন দত্তের তদারকিতে কাজ গতি পাচ্ছে। আমার উপর কোন দায়িত্ব পড়লে সে দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুজনদার তাগদা চলতো ক্রমাগত আর সে সঙ্গে আমার কাজের গতিও বেড়ে যেত। আমার প্রায় সমস্ত সময়ই ব্যয় হত এদিকে। কোন জিনিস কম পড়লে বা না থাকলে সুজনদা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করতেন। তাই কাজের গতি থমকে যেত না। আমাদের প্রেরণার উৎস মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায় গৌহাটি থেকে আসার পথে

বঙ্গভবনে প্রায়ই আসতেন। খোঁজ খবর নিতেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন আর নির্দেশিত কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দূরভাষ যোগে খোঁজ নিতেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন ২৪/১২/২০১২ দুপুর ২টা নাগাদ মন্ত্রী বঙ্গভবনে আসনে। তখন আমাদের পাথরের অভাব ছিল, তিনি সব শুনলেন, বললেন সব হবে। ৩১/১২/২০১২ রাত ৯টায় পাথরের ১০টি গাড়ি আসে, রাত ৩টার সমস্ত গাড়ির পাথর সমঝে নেই। তখন উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী ও বঙ্গভবন নির্মাণ উপসমিতির সভাপতি সুজন দত্ত। আরেক বার ২/২/২০১২ মাননীয় মন্ত্রী বঙ্গভবনে আসেন। কথা প্রসঙ্গে আমি জানাই সাটারিং এর কাঠ কম হওয়ায় কাজের গতি কমে গেছে। শুনে বললেন, 'হবে'। ৫/২/২০১২ তারিখ আমাদের প্রয়োজনীয় কাঠ এসে পৌঁছে যায়, কাজ আবার গতি লাভ করে।

মাননীয় মন্ত্রী ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সুজন দত্ত, আশীষ গুপ্তের সময়োপযোগী নির্দেশে এত বড় একটা কাজ মাত্র ১০০২ দিনে সমাপ্ত হয়।

কাজে লাগানো কোন জিনিসের গুণগত মানের সাথে সমঝোতা করা হয়নি। আমার এবং গুপ্তদা ও সুজনদার মধ্যে এমন একটা চমৎকার তালমিল ছিল, তাই কাজ করতে আমাদের কোন ঝামেলার সৃষ্টি হয়নি। বঙ্গভবনে অনেক সভ্যই আসতেন, দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, রূপু চন্দ, সীমান্ত ভট্টাচার্য আসতেন, বসতেন আমাদের খোঁজ খবর নিতেন, উৎসাহ দিতেন।

পরিকাঠামো শেষ হওয়ার পর শুরু হয় আসল কাজ অর্থাৎ সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ। মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায়, আশীষ গুপ্ত, সুজন দত্ত, তৈমুর রাজা চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত সবাই মিলে একমত হয়েই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়। দেশের নামিদামী সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া হয়। কাজ করতে এসে বাইরে সংস্থাগুলো যাতে কোন অসুবিধায় না পড়ে তার উপর নজর রাধা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল আমার উপর। দিন রাত কাজ চলেছে। রাতের কাজ আমাদের করতে হয়েছে বেশ কিছু। সমস্তদিন ছাদের রড, বাঁধন পরীক্ষা করে ভোর ৪টা থেকে ছাদ ঢালাই শুরু করা হত। শেষ হতে হতে দুপুর ১২টা- ১টা হয়ে যেত। এভাবে ২টা বড় ছাদ ঢালাই হয়।

কাজ শেষ। এখন অবসর সময়ে বসে বসে ভাবি এত কাজ এত সুন্দরভাবে শেষ তো হল। কোন সংস্থার কোনরকম টাকা পাওনা নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বঙ্গভবন দেখে যান। তিনি বলেন 'এত সুন্দর স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ আমাদের আসামের গর্ব। তাকে রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত কঠিন, এদিকে নজর দিতে হবে।'

রক্ষণাবেক্ষণ এর আর্থিক দিক দেখবেন বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। সে সঙ্গে এটাও নজর রাখতে হবে এতবড় ভবনের যাতে কোন ধরনের ক্ষতি না হয়। এ মহান যজ্ঞে যাদের উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ছিল তাঁদের কথাও এখানে উল্লেখ রাখা প্রয়োজন। এরা হলেন ইলেকট্রিফিকেশন সঞ্জীব পাল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-মেসার্স ব্লু স্টার, চেয়ার-মেসার্স রানা চেয়ার, দিল্লি, আলো ও শব্দ Ace Acustic & Video Solution Pvt. Ltd. Guwahati, লিফট-এর জন্য OTIS, পাইপ মিস্ত্রী সুভাষ বাউরি, ভবনের রং নির্বাচন করেন দীপঙ্কর দে, Grill মইন খান, Front view-M/S Alomex Delhi, Accoustic- M/S S. B. Enterprise, Kolkata, Front চিত্র বাচ্চু দাস, বঙ্গভবন সাইনবোর্ড মৃণালকান্তি রায়, রাজমিস্ত্রি রঞ্জিত দাস, কাঠের কাজ গৌতম রবিদাস, রং মিস্ত্রি রঞ্জু দেব, টাইলস্ রাজেশ কুমার।

বঙ্গভবন তৈরি হয় এ অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চার জন্য যে মমতায় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায় এ ভবন তৈরি করতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন তা তখনই সার্থক হবে যদি যারা এ ভবনটি ব্যবহার করবেন তারা ভবনের প্রতি যত্নবান হন। সবাই যে ভবনের Stage ও Auditorium কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, পানের পিক, খাবারের প্যাকেট, জলের বোতল যেখানে খুশি ফেলে নোংরা ও আবর্জনা স্তুপ তৈরি না করেন। ভবন নির্মাণের একজন কর্মী হিসেবে শিলচর তথা বরাকবাসীর প্রতি এ আমার বিনম্র প্রার্থনা।

# সম্প্রসারিত বঙ্গভবন: কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

**জয়ন্ত দেব রায়**

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্প্রসারিত পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবন নির্মাণে তহবিল সম্পর্কিত প্রতিবেদন লিখতে বসে আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছি এই ভেবে যে এইরূপ একটি ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের আমিও একজন সঙ্গী ছিলাম। এরকম একটি মহাযজ্ঞে জড়িত থেকে আমি গর্ববোধ করছি। বরাক উপত্যকার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়াসে যেসকল ব্যক্তিবর্গ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খ্রিঃ) কাছাড় বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন নাম দিয়ে একটি সংগঠনের জন্ম দিয়েছিলেন, তা আজ বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন নামক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কোনরূপ সরকারি আনুকূল্য ছাড়া কেবলমাত্র সদস্যচাঁদা, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিবিশেষের অনুদানের উপর নির্ভর করে এই সংগঠন বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে পঁচিশটি জাতীয় স্তরের অধিবেশনের আয়োজন করেছে। বিগত তিন দশকে অনেক আবেদন নিবেদনের পর সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির নামে ১৪০২ বঙ্গাব্দে (১৯৯৪ খ্রিঃ) শিলচর তারাপুর অঞ্চলের চাঁদমারি রোডে সরকারি জমি পাওয়া যায়। বিভিন্ন কারণে ঐস্থানে সম্মেলনের কোনও নির্মাণকার্য এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। তারপর ১৪১১ বঙ্গাব্দে (১০০৪ খ্রিঃ) আসাম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায়ের সৌজন্যে শিলচরের সদরঘাটে সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির জন্য একখণ্ড সরকারি জমি (প্রথমে ৫ কাঠা এবং পরে আরও ৪ কাঠা) আমরা পাই। এখানে উল্লেখ্য যে এই জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে কাছাড় জেলা সমিতির তৎকালীন সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস এবং তৎকালীন জেলা সম্পাদক প্রদীপ আচার্য প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। তখন থেকেই আমরা স্থানে কাছাড় জেলা সমিতির একটি সুন্দর কার্যালয় ভবন নির্মাণ করার স্বপ্ন দেখতে থাকি। কিন্তু ঐসময় তেমন কোনও আর্থিক সংগতি বা তহবিল না থাকায় আমাদের স্বপ্ন বাস্তবরূপ ধারণ করতে পারেনি। তারপর ১৪১২ বঙ্গাব্দে (২০০৫ খ্রিঃ) সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের উদ্বৃত্ত অর্থের উপর নির্ভর করে মোটামুটি কাজ চালানোর মত একটি কার্যালয় গৃহ বঙ্গভবন নাম দিয়ে নির্মাণ করা হয়। তখন সেই বঙ্গভবনের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ নিয়মিত ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। সেই ব্যয়ভার বহনের জন্যে সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রী গৌতম রায় ২০১১ সালের মার্চ মাস থেকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন। ঐ বছরেরই জুন মাসে বঙ্গভবনে সম্মেলনের এক সভায় 'জুলাই মাস থেকে' মন্ত্রী গৌতম রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাসিক অনুদান দশ হাজার টাকা দেবার ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয় সেই সভায় তিনি নতুনভাবে পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবন সম্প্রসারণের কাজে হাত দিতে আমাদের উৎসাহিত করেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। যথারিতি ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে সম্প্রসারিত পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভবন নির্মাণের শিলান্যাস করেন গৌতম রায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ২০১১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কাছাড় জেলা সমিতির বর্তমান কার্যকরি সমিতির প্রথম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐদিন সন্ধ্যায়

বঙ্গভবনের প্রাচীর নির্মাণের শিলান্যাস করেন মন্ত্রী গৌতম রায় এবং ঐ কাজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তিনি বহন করেন। সম্প্রসারিত বঙ্গভবন যাতে আধুনিক মানের হয় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য ভবন থেকে কোনও অংশে যাতে ঘাটতি না থাকে সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ দৃষ্টিপাতের পরামর্শ দেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গভবন সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হয়। আগস্ট মাসে বঙ্গভবনের শিলান্যাসের পর সেপ্টেম্বর মাস থেকে মন্ত্রী গৌতম রায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত অনুদান প্রায় আশি লক্ষ টাকা দিয়ে পূর্ণোদ্যমে বঙ্গভবন নির্মাণকার্য শুরু হয়। এরপর সম্মেলনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। শিলচরের তদানীন্তন সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ মহাশয় তাঁর সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রথম কিস্তিতে পাঁচ লক্ষ এবং পরবর্তীতে একটি জেনারেটর ক্রয় করার জন্য তেরো লক্ষ টাকা প্রদান করেন। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আসাম সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক বঙ্গভবন নির্মাণ কল্পে এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেন। ব্রহ্মক্ষপুত্র উপত্যকায় দুই রাজ্যসভার সদস্য পঙ্কজ বরা এবং শ্রীমতী নাজনিন ফারুকি প্রত্যেকে বঙ্গভবন প্রকল্পে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। বরাক উপত্যকায় নির্মীয়মান কোনও প্রকল্পে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে এই বিশাল অঙ্কের অনুদান প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র মন্ত্রী গৌতম রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। বরাক উপত্যকার বিধায়ক এবং আসাম সরকারের মন্ত্রী অজিত সিংহ ব্যক্তিগতভাবে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন বঙ্গভবন প্রকল্পে সাড়ে বারো লক্ষ টাকা দান করেন এবং টি অ্যাসোসসিয়েশন অব ইন্ডিয়া থেকে আমরা পাই প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা। শিলচর মারচেন্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রদান করেন দুই লক্ষ টাকা। এছাড়া ব্যক্তিগত চাঁদা প্রায় বাইশ হাজার টাকাও সংগ্রহ করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে আরম্ভ করে ২০১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাব করলে দেখা যায় বঙ্গভবন সম্প্রসারণ কার্যের প্রথম পর্যায়ে সংগৃহীত অনুদান প্রায় তিন কোটি পনেরো লক্ষ যাট হাজার টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ সংগৃহীত অনুদানের প্রায় সম্পূর্ণ অর্থই খরচা হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ২০১৩ জানুয়ারি থেকে ২০১৪ আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গভবন নির্মাণ প্রকল্পের মন্ত্রী গৌতম রায়ের উদ্যোগে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উন্নয়ন তহবিল থেকে অনুদান সংগৃহীত হয় এবং মন্ত্রী গৌতম রায়ের তত্ত্বাবধানে বঙ্গভবন সম্প্রসারণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়।

এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত বঙ্গভবন সম্প্রসারণ প্রকল্পে খরচা হওয়া অনুদানের একটি আনুমানিক পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে দেওয়া হল—

| | **খরচের বিষয়** | **অর্থের পরিমাণ** |
|---|---|---|
| ১। | মূল ভবন নির্মাণ | ৩,৩০,৪০,০০০/- |
| ২। | এলিভেটর (লিস্ট) স্থাপন | ২২,৭৪,০০০/- |
| ৩। | বৈদ্যুতিকরণ | ৩৭,৭২,০০০/- |
| ৪। | প্রেক্ষাগৃহের চেয়ার | ৩০,৯১,০০০/- |
| ৫। | শীততাপ নিয়ন্ত্রণ | ১৯,৫০,০০০/- |
| ৬। | প্রেক্ষাগৃহের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা | ৭১,৫০,০০০/- |
| ৭। | মঞ্চসজ্জা | ৩১,৯৮,০০০/- |
| ৮। | আসবাবপত্র | ৪,৮৭,০০০/- |
| ৯। | জেনারেটর সংস্থাপন | ১৭,৪৩,০০০/- |

| | | |
|---|---|---|
| ১০। | অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা | ৬,৭৪,০০০/- |
| ১১। | প্রেক্ষাগৃহের শব্দ ব্যবস্থাপনা | ২০,৮০,০০০/- |
| ১২। | বঙ্গভবনের বিভিন্ন শিল্পকর্ম | ৬,৭০,০০০/- |
| ১৩। | বৈদ্যুতিক শুল্ক এবং কার্যালয় পরিচালনা | ৫,১৬,০০০/- |
| ১৪। | বাস্তকারের সাম্মানিক | ৩,২০,০০০/- |
| | **মোট খরচ—** | **৬,০৯,৬৫,০০০/-** |

বঙ্গভবন উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা সম্পাদকের নির্দেশানুসারে সম্প্রসারিত বঙ্গভবন নির্মাণের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তহবিল সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেহেতু বঙ্গভবন প্রকল্পের জন্য সংগৃহীত অনুদান এবং খরচের হিসাব, হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষানিরীক্ষার পর আগামী সাধারণ সভায় পেশ করা হবে, সেহেতু বর্তমান নিবন্ধে সম্প্রসারিত বঙ্গভবন নির্মাণ কার্যের তহবিলের একটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ চিত্রই তুলে ধরা হল। প্রতিবেদনটি লিখতে গিয়ে দ্বিধাহীনভাবে যে কথাটি উচ্চারণ করা প্রয়োজন সেটা হল এই সম্প্রসারিত বঙ্গভবন নির্মাণ প্রকল্পে অনেকেই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, কিন্তু মন্ত্রী গৌতম রায় যেভাবে একক প্রচেষ্টায় তহবিল সংগ্রহে এবং বিভিন্ন বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন এই মুহূর্তে বোধহয় এর কোনও নিদর্শন নেই। সে জন্যে যথার্থ অর্থে সম্প্রসারিত বঙ্গভবনের রূপকার গৌতম রায়কে আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জানাই।

এ উপত্যকার সুস্থ সামাজিক এবং সংস্কৃতিচর্চাকে ধরে রাখতে এই বঙ্গভবনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বঙ্গভবনের উদ্বোধনের পর এই মুহূর্তে প্রয়োজন হবে বঙ্গভবনের সংরক্ষণ এবং এর জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ পরিচালনা সমিতি, যা নিয়মিতভাবে ভবনের বিভিন্ন বিভাগের কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে। নিজেদের অস্তিত্ব এবং অধিকার সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত করতে বিগত তিন দশকেরও উপর আপন কর্মধারায় বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন সুচিন্তিতভাবে এগিয়ে চলেছে, এরই ফসল এই ‘বঙ্গভবন’। সম্মেলনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড যেমন ব্যতিক্রমধর্মী তেমনি আগামীতে এই বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিতব্য সমস্ত অনুষ্ঠানাদি যাতে এ উপত্যকার সুস্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় ব্রতী থাকে এবং উপত্যকার বিভিন্ন ভাষিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে সেদিকে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে এই আশা ও অঙ্গীকার করে সম্মেলনের একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে আমার এই প্রতিবেদন সমাপ্ত করছি। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন দীর্ঘজীবী হোক।

# উনিশ, একুশ

**বিজয়কুমার ভট্টাচার্য**

একুশের ফুল বাসি হয় না কখনো
মাতৃগর্ভে জন্ম নেয় নিয়ত উনিশ
বিশ্বাস না হয় যদি তো জিজ্ঞেস করো
বলবে ভারত বাংলাদেশের পুলিশ

উনিশ একুশ দ্যাখে গাঙ্গেয় জোয়ার
উনিশ একুশে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ
উনিশ একুশ বাংলাভাষার অহংকার
উনিশ একুশ যুদ্ধ জয়ের সংবাদ

ফেব্রুয়ারি মে মাসের রক্ত সূর্যোদয়
যে আলো ছড়ালো তার দীপ্তি নিয়ে পরে
জুলাই আগস্ট দ্রুত হল স্বপ্নময়
সময়েরা শহিদের জয়ধ্বনি করে

সালাম জব্বার আর কুমুদ রফিক
শচিন কমলা যিশু জগন হীতেশ
বাচ্চুর দুঃসাহস যথার্থ নির্ভী
ভাষা শহিদের নেই দেশ ও বিদেশ

পৃথিবীর যে-যেখানে লড়ছে এখন
পিপাসা মেটাতে চায় নিজস্ব ভাষায়
একুশ উনিশ তার পূর্ণ সমর্থন
ভাষা স্রোতস্বিনী বয়ে যায় মোহনায়।

# আমাদের সবার অহঙ্কার,
# আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসের স্বপ্নকল্প ফসল

## গৌতম রায়

আমি সুদীর্ঘকাল থেকে আসাম সরকারের মন্ত্রীসভায় আছি, বিভিন্ন মন্ত্রকের দায়িত্বভার সামলেছি। তো, মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে আসামের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। আসামের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বহুবার ঘুরতে গিয়ে দেখেছি অসমিয়ারা কীভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের মাতৃভাষার উন্নতির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি অসমিয়া সহ আসামের সকলের মাতৃভাষারই উন্নতি চাই।

যেহেতু আমি বাঙালি, তাই বাঙালি হিসেবে আসামে বাংলা ভাষার উন্নতি বা প্রসার কতটা কীভাবে হচ্ছে সে বিষয়েও আমার সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। অসম সাহিত্য সভার বিশাল কর্মকাণ্ড এবং সব জায়গায় বিশাল বিশাল ভবন দেখে আমার মনে বার বার একটা প্রশ্ন জেগেছে যে আমাদের বরাক উপত্যকায় মাতৃভাষার জন্য ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮৬ সালে বারবার রক্ত ঝরাতে হল অথচ আমাদের বাংলা ভাষা সংস্কৃতিচর্চার জন্য এখানে কোনও উপযুক্ত ভবন কেন নেই? আমাদের আসাম একটি বহুভাষিক রাজ্য। বরাক উপত্যকায়ও বহু ভাষাভাষী মানুষের বসবাস। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এই বহুভাষিক চরিত্রকে রক্ষা করে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছে। তাই আমার মনে হল উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ একটি ভবন গড়ে তোলা দরকার। সেই পরিকল্পনা থেকেই শিলচরে 'বঙ্গভবন' সম্প্রসারিত এরূপ ধারণ করেছে। করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে নিজস্ব ভবন থাকলেও সেগুলো আকারে ছোট। কিন্তু শিলচর যেহেতু বরাক উপত্যকার প্রধান শহর এবং সবকিছুর কেন্দ্রস্থল তাই আমার মনে হল বড় আকারে একটি ভবন এখানে গড়ে তোলা উচিত। এখানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। সেখানে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয় কিন্তু শিলচরের মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তাই বঙ্গভবনে গড়ে তোলা আধুনিক প্রেক্ষাগৃহে সবদিক থেকে উপযুক্ত হবে বড় অনুষ্ঠান করার, সেখানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুষ্ঠান করতে পারবে। তাছাড়া, এই ভবনে ভাষা আন্দোলনের সমস্ত দলিল দস্তাবেজ রাখার জন্য একটা ঘরও রাখা যেতে পারে। এই ভবন আমাদের সবার অহঙ্কার, আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসের স্বপ্নকল্প ফসল। নিজেদের দায়বদ্ধতা, উৎসারিত আবেগের তাড়নায়ই এই কাজটা করে গেলাম। আমরা আমাদের কাজ না করলে কে করবে? পিছন ফিরে দেখব যখন আগামীদিনে 'বঙ্গভবন'ই হবে আমাদের অফুরান তৃপ্তির উৎস। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও তো জবাবদিহি করতে হবে। আমরা যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ ধরনের কিছু রেখে না যাই তাহলে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার অবস্থা বরাকেও দেখা দেবে। আমার আশা এই 'বঙ্গভবন' বরাক উপত্যকায় সমস্ত ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। বঙ্গভবনের এই বিশাল নির্মাণকাজ করতে গিয়ে আমি অর্থ সাহায্য পেয়েছি মাননীয় সাংসদ পঙ্কজ বরা, নাজনিন ফারুকী এবং কবীন্দ্র পুরকায়স্থের কাছ থেকে। এছাড়াও বরাকের বিভিন্ন চা-বাগান থেকেও অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। বরাকের উন্নতির জন্য বরাকের সব বিধায়কদের দেওয়া ১০০০ কোটি টাকার তহবিল যখন সব বিধায়করা পেলেন, আমি তাঁদের টাকার অংশ থেকেও বঙ্গভবনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছি। আর কাটলিছড়ার উন্নয়নের টাকা থেকেও আমি 'বঙ্গভবনে'র জন্য দু-হাতে ঢেলে দিয়েছি। সরকারের কাছ থেকে জমি আনার কাজটিও আমি করেছি।

ভবিষ্যতে আমি চাই এই সম্প্রসারিত 'বঙ্গভবন' তার উদ্দেশ্য পূরণের কাজ করে যাবে। বাঙালির সংস্কৃতিকে বিকশিত করার পাশাপাশি উপত্যকার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতিভার বিকাশও সাধিত করবে এই বঙ্গভবন, এটাই আমার আন্তরিক কামনা।

# রূপান্তরের কথা

## বিভাসরঞ্জন চৌধুরী

স্বপ্ন রূপান্তরিত হল বাস্তবে। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতি শুধু পায়ের নিচের মাটিই পেল না, পেল মাথার উপর ছাদও। এটুকু বললে সঠিক বলা হল না। বলা উচিত এক সুন্দর পরিবেশে পায়ের নিচে মূল্যবান একখণ্ড মাটি, আর মাথা গোঁজার জন্য এক সুরম্যভবন। কিন্তু মাটি আর ভবন রাতারাতি মূল্যবান আর সুরম্য হয়ে দেখা দেয়নি। তার পেছনেও ছিল সলতে পাকানোর ইতিহাস, ছিল উপকরণরূপ সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ, সংস্থা তথা প্রাশসনিক বিভাগের মধ্যে এক সফল রসায়ন, ছিল সময়োপযোগী সমন্বয়। সদস্যদের স্বপ্ন ছিল, সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না সংগঠনের ভ্রাম্যমাণ দপ্তরকে কোথাও স্থায়ী করে সমিতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করা, কিংবা সভার আয়োজন করা। সভাপতি কিংবা কোন সদস্যের বাড়িতেই বা কোন বিদ্যালয় গৃহে ছুটির দিনে এই প্রয়োজনগুলো সারতে হত। তাই ঐ দিনগুলিতে অনেক সাধ থাকলেও সাধ্য না থাকায় সদস্যদের গোপনেই স্বপ্ন দেখতে হত। কিন্তু দীর্ঘ শবরী প্রতিক্ষারও অবসান হয়। এক্ষেত্রে হ'ল তাই। এক নতুন রসায়ন শুরু হল ২০০৩ থেকে, যে রসায়নের উল্লেখ এখানে ইতোমধ্যেই হয়েছে।

সে বছর দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস জেলা সমিতির সভাপতি হলেন। প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলাশাসক হওয়ার সুবাদে সরকারের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কিছুই জানতেন বলে নিজে উদ্যোগী অনেক আশায় বুক বেঁধে জেলা সমিতি থেকে সরকারের কাছে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের জন্য জমি চেয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সরকারের কাছে সমিতির গৃহীত ঐ প্রস্তাব সহ জমি প্রার্থনা করে আবেদন করলেন এবং কিছুটা প্রভাব খাটিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে জেলাশাসকের কাছে দশকাঠার জন্য এক সুপারি ও করিয়ে নিলেন। জেলাশাসক সেটাকে পরে পাঁচকাঠায় সীমিত করে সরকারের কাছে সুপারিশসহ আবেদনটি পাঠিয়ে দিলেন। কর্মনিয়োগ দপ্তরের বাতিল করা এক এদোঁ পুকুর থাকা ঐ জমি কারো কাছেই লোভনীয় মনে হয়নি। 'লেগে থাকায়' বিশ্বাসী বিশ্বাস মহাশয় সম্পাদক প্রদীপ আচার্যকে নিয়ে এরপর তদানীন্তন রাজস্বমন্ত্রী গৌতম রায়ের সঙ্গে যখন শিলচর আবর্তভবনে দেখা করলেন, তখন মন্ত্রীমহোদয় সুস্পষ্টভাবেই ঐ জমি বরাদ্দ করার আশ্বাস দিলেন। আর কী আশ্চর্য, 'মেঘ না চাইতেই জল'। মন্ত্রীমহোদয় ভবন তৈরির জন্য পাঁচলক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সদস্যদের তখন উৎসাহের অন্ত নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবও পাঁচ লক্ষ টাকার সাহায্য দিয়ে আরও পাঁচ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আরোও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটলো। এই সংগঠন থেকে দূরে-থাকা অন্য জনপ্রতিনিধিরাও তখন থেকে একে প্রাসঙ্গিক ভাবতে শুরু করলেন।

প্রবল উৎসাহে শ্রী বিশ্বাস তখন সম্পাদক প্রদীপ আচার্যকে নিয়ে জমিতে রোজ হাজিরা দিচ্ছেন, মাপজোখ করছেন, সীমানা চিহ্নিত করছেন, কখনো বা ডোবায় আটকে পড়া অসহায় এক গরুকে উদ্ধারের জন্য টানাটানি

করছেন। আর এসব লক্ষ্য করছেন পৌরকর্মী পরিতোষ দে। উৎসাহ তার মধ্যেও সঞ্চারিত পুকুর ভরানোর জন্য তিনি পৌরসভা থেকে সুযোগ নিলেন, আবর্জনা দিয়ে অনেকটাই ভরিয়ে দিলেন। তারপর ধী-রে ধী-রে প্রথম ভবন। সদস্যদের উৎসাহের অন্ত নেই। এতটুকু হচ্ছে স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়। কিন্তু কিসের যেন একটু অভাব। বড় অনুষ্ঠান করতে ছুটতে হচ্ছে অন্যত্র।

মন্ত্রী গৌতম রায়ও এসে ভবন দেখে গেছেন। খুব খুশি। কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত।' কিছু দিন পর মন্ত্রীমহোদয় তাঁর ইচ্ছে ব্যক্ত করে বললেন এ উপত্যকায় আমাদের এই সংগঠনের বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত এমন একটি সুরম্যভবন চাই-যা নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি এবং এখানে আসা বর্হিবরাকের মানুষের কাছে যে তা হয় অন্যতম দর্শনীয় ভবন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। জেলা সমিতির সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী ও সম্পাদক দীপক সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে শুরু হল দ্বিতীয় পর্যায়ের 'রূপান্তর'। এরকম একটি ভবনের জন্য চাই আরো জমি। আবার সেই গৌতম রায়। জমি বিস্তৃত হল। সমস্ত জমিটি প্রাচীর ঘেরা হল-ও তাঁরই সৌজন্যে। জৌলুষে ও কর্মতৎপরতায় দ্বিতীয় পর্যায়ের রূপান্তর আরও চমকপ্রদ। সমাজ ও সরকারের বিভিন্ন অলিন্দে বহুলোকে সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা তৈমুর রাজা মহাশয়ের সঙ্গে মন্ত্রী গৌতম রায়ের ভবন নির্মাণ প্রকল্পে এক ঐকতান থাকায় যখন যেখানে যাঁর সঙ্গে যে প্রয়োজন তা যথাসম্ভব দ্রুততায় নিস্পন্ন হওয়ায় অবিশ্বাস্যভাবে ভিত্তিস্থাপনের সময় থেকে মাত্র আঠাশ মাসের মধ্যে ভবন নির্মাণের সমস্ত কাজ হল সম্পূর্ণ।

এখানে অবশ্যই স্বীকার্য এ ধরনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করতে যে বিপুল সম্পদ দরকার তার সংস্থানের জন্য প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক উদ্যোগ, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এক সংগঠক। মন্ত্রী মহাশয় তাঁর ব্যস্ততার মধ্যেও সংগ্রহ করে দিয়েছেন প্রচুর অর্থ, দিয়েছেন আরও অর্থের উৎসের সন্ধান। কিন্তু এর সঠিক ব্যবহার করতে চাই সুদক্ষ পরিচালনা ও নেতৃত্ব যিনি সমস্ত কিছুর সমন্বয় ঘটাতে পারেন। যিনি অনুঘটক হিসাবে এতগুলো বিষয়ের যথাযথ অনুপাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রার্থিত বস্তুটি উপস্থাপিত করতে পারেন। আমাদের সৌভাগ্য আমরা দুই অনুঘটক পেয়েছিলাম দুই পর্যায়ে, প্রথম পর্যায়ে দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস আর দ্বিতীয় পর্যায়ে তৈমুর রাজা চৌধুরী। আর পেয়েছিলাম তাঁদের সেনাপতি, প্রদীপ আচার্য ও দীপক সেনগুপ্ত। হ্যাঁ, অবশ্যই সেনাবাহিনীও ছিল তাঁদের। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যদের ক'জনের নাম আর উল্লেখ করা সম্ভব?

ইতিহাসে দুই সার্থক 'অনুঘটক' নেতা আর সেনাপতিদের নামে আড়ালে বাকিরাও থাকবেন অবশ্যই।

# ‘নৃতত্ত্বের উদ্যান’
# বরাক উপত্যকায় এ ভবন যেন হয়ে ওঠে আস্থার স্থল

**তুষারকান্তি নাথ**

‘বঙ্গভবন’ সম্পর্কে উপলব্ধি-অনুভব প্রকাশ, তাতে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে আমাদের এ অঞ্চলভূমির বাঙালি ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গোড়ার কথা। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরপূর্বের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ এক মনোরম প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ বিরাজ করছে কাছাড় তথা বরাক উপত্যকায়। বৈচিত্র্য রয়েছে এখানকার জনবসতির মধ্যেও। অস্ট্রিক-মঙ্গোলীয়-আলপীয় ইত্যাদি নৃ-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে পূর্বভারতে যেভাবে বাঙালি জাতির অভ্যুদয় ঘটেছিল, বরাক উপত্যকায়ও তা একইভাবে হয়েছে। এখানে বাংলা ভাষা-সাহিত্যচর্চার ইতিহাসও বহু প্রাচীন। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে বাংলা ভাষা তার রূপ পরিগ্রহ করেছিল পূর্বভারতের যে ভাষা-অঞ্চলে, বড়াইল-ভুবন-লুসাই পর্বতমালার পাদদেশের কাছাড়ও নিঃসন্দেহে সেই ভাষা-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে ধরে রেখেছে কাছাড়-হাইলাকান্দি-করিমগঞ্জের আঞ্চলিক বাংলা ভাষা। চর্যাপদ বঙ্গদেশের কোন বিশেষ এলাকার মাটির রসে ফলশালী, এই ইতিহাস এখনও অনুদঘাটিত। চর্যাপদে ব্যবহৃত বহু শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, বাগ্ধারা কাছাড় তথা বরাক উপত্যকায় এখনও মৌখিকভাবে প্রচলিত ও প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন। চর্যাকারদের জন্মস্থান বা বাসস্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে ও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তাঁদের অন্তত কয়েকজন কাছাড়ের সন্তান হলেও হতে পারেন, এই দাবি চর্যাপদের ভাষার রূপগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই রয়েছে। চর্যাপদে এখানকার প্রচলিত প্রচুর শব্দের প্রায় অবিকৃত অবস্থার সমাহার-সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, উপজাতীয় রাজারাই বহুকাল যাবৎ ছিলেন আমাদের বর্ণময় অঞ্চলভূমির সাংস্কৃতিক ইতিহাস তথা সমাজ কাঠামোর মূল চালিকাশক্তি। এখানে এসে মিলিত হয়েছে সংস্কৃতির নানা ধারা-উপধারা। নানা মত ও পথের সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টিতে উপজাতীয় রাজারাই ছিলেন সচেষ্ট। মধ্যযুগের হেড়ম্ব রাজ্যের (কাছাড়) ইন্দো-মঙ্গোলীয় ডিমাসা রাজন্যবর্গ এখানে শাসনকার্য, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য— ‘ত্রিপুরায় ও কাছাড়ে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা খুব বেশি হয় নাই এবং - সেই কারণেই কি?- সেখানে বাঙালা ভাষার মর্যাদা শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ..... কাজকর্মে বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম এবং ব্যাপক ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দী হইতে ত্রিপুরা-কাছাড়-কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি।’ বস্তুত মধ্যযুগের হেড়ম্ব রাজদরবার (মাইবাং ও খাসপুর) বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। রাজদরবারের বাইরেও বাংলা ভাষা-সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এর প্রমাণ কাছাড়ের

গ্রামাঞ্চলের প্রাচীন বসতি এলাকাগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর হাতে লেখা পুথি। ব্রিটিশ শাসনকালেও এখানে বাংলা সাহিত্যচর্চা হয়েছে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষ লোকসাহিত্যের চর্চায় ব্যাপৃত থেকে মানসিকভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করত। নিরন্তর সেই চর্চাই এখানকার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারটিও সমৃদ্ধ করেছে। বিদ্যোৎসাহিনী রানি চন্দ্রপ্রভা, ইন্দুপ্রভা, রাজা মেঘনারায়ণ, সুরদর্পনারায়ণ, রামচন্দ্রধ্বজনারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্রনারায়ণ, গোবিন্দচন্দ্রনারায়ণ আমাদের সমাজ-ভাষা-সাহিত্য-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির এক নিরন্তর আলোকরেখার পথসংকেত দিয়ে গেছেন। তাঁদের প্রদর্শিত সাংস্কৃতিক ও আস্তিত্বিক পরম্পরার পথ ধরে আর ভাষা-শহিদের চেতনা-সম্পদকে আত্মস্থ করে আমরা হেঁটে চলেছি।

বাইরের বাও-বাতাস এখানে ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসেছে ঠিক, কিন্তু আদি-সংস্কৃতিকে এখনও একেবারে মুছে দিতে পারেনি। হাল আমলে এল নতুন আরেক তরঙ্গাভিঘাত বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের 'বৈশাখী কালো মেঘ' এখন ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে-বাতাসে। পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত উত্তরপূর্ব ভারত জুড়ে। ব্যতিক্রম নয় কাছাড় তথা বরাক উপত্যকাও। বিশ্বায়নের চটকে এখানেও মানুষ শেকড় আর মাটিকে অস্বীকার করে আকাশে ডানা মেলতে চাইছে। কোনও কিছুতেই যেন আর আমাদের মমত্ববোধ নেই। উপত্যকার চেহারায় 'ব্যর্থ উত্তরাধিকার, দুর্বল উত্তরাধিকার' নিয়েই এক আলুথালু পরিবেশ। বিপদ আমাদের ঘরে-বাইরে। তাই আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষায় বিশেষ তৎপর বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। খুশির কথা, বঙ্গবিদ্যাচর্চা ও ভাষা-সংস্কৃতির সুষ্ঠু পরিচর্যা ও বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে শিলচরে 'বঙ্গভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই উপত্যকাকে পণ্ডিতেরা 'নৃতত্ত্বের উদ্যান' রূপে অভিহিত করেছেন। এই নৃ-মালঞ্চটিও যেন এখানে স্থান পায়, শোভা পায় আমাদের কাজকর্মে।

# যেন ভুলে না যাই আমাদের সেই কাঁচা ঘরটিকে

ড॰ সৌরীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে আমরা যারা সদস্য রয়েছি, তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য প্রধানত দুটোই। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বরাক উপত্যকায় বাংলায় পড়াশোনা ও সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার যে অধিকার আমরা পেয়েছি, তার বিরুদ্ধে আগ্রাসন রোধ করা এবং ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ করে দেওয়া। আর এসব করতে গিয়ে প্রতিনিয়তই আমরা অনুভব করেছি যে আমাদের সংগঠনের নিজস্ব একটি ঠিকানার বড়ই প্রয়োজন। কারণ ঠিকানাবিহীন কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের কোন গুরুত্বই থাকে না। তাই এ নিয়ে শুরু হল আমাদের মধ্যে চিন্তাচর্চা এবং একটুকরো জমি আদায়ের লক্ষ্যে চলল সম্মিলিত প্রয়াস। আন্তরিকভাবে কোন কাজে হাত দিলে যে কাছে সফলতা পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হল। শেষ পর্যন্ত পৌরসভা দপ্তরেরর সন্নিকটে একটুকরো জমির (জমি না বলে একটি জলা জায়গা বললেই বোধ হয় ভাল হত) সন্ধান মিলল। তদানীন্তন সাংসদ সন্তোষমোহন দেবের সুপারিশে কাছাড়ের Land Advisory Committee ওই জমিটা বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের তাছাড়া জেলা সমিতির নামে বন্টন করে দেয় আর মন্ত্রী গৌতম রায়ের প্রচেষ্টায় দিসপুরও এতে সীলমোহর বসিয়ে দেয়।

এরপরেই শুরু হ'ল ভবন তৈরির উদ্যম। প্রথম একটি ছোট বাঁশের ঘরই হ'ল আমাদের আস্থানা। ওই পর্যায়ে তদানীন্তন সম্পাদক প্রদীপ আচার্যের উদ্যম ছিল লক্ষ্য করার মতো। যাই হোক তদানীন্তন জেলা সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে ওই বাঁশের ঘর থেকেই পূর্ণদ্যোমে চলল আমাদের কাজকর্ম। কাঁচা ঘর হলেও নিজস্ব ঘরে বসে কাজ চালানোর সুযোগ পেয়ে আমাদের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু জীবন তো একজায়গায় থেমে থাকে না। তাই সবাই মিলে নেমে পড়া গেল ছোট একটি পাকা ভবন তৈরির কাজে। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন অনন্ত দেব মহাশয়। সাংসদ সন্তোষমোহন দেব মন্ত্রী গৌতম রায়, শ্রীমতী সুস্মিতা দেব (সভাপতি-আঁশিয়া), বিধায়ক কুতুব আহমেদ মজুমদার প্রমুখের আর্থিক আনুকূল্যে ভবনটি তৈরি হ'ল বটে, কিন্তু যার সহায়তা না পেলে ভবন নির্মাণের কাজে আমরা হাতই দিতে পারতাম না তিনি হলেন অনন্ত দেব মহাশয়। বঙ্গসাহিত্যের বিগত একটি সম্মেলনের (সম্ভবত একাদশ সম্মেলন) উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করে যখন তা লক্ষাধিক্যে পৌঁছল, তখন তিনি ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে সেই অর্থ নির্মাণ সমিতির হাতে অর্পণ করেন। এর পরেই

নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়। তাঁকে আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি প্রয়াত প্রসূনকান্তি দেব ও প্রয়াত মৃণালকান্তি দত্তবিশ্বাসকেও। বঙ্গ সাহিত্য তাদের অবদান কোনদিনও ভুলবে না।

যা'ই হোক, ভবন নির্মাণ ও তার উদ্বোধন সুচারুরূপেই সম্পন্ন হল। প্রদীপ আচার্যের প্রস্তাব মতো ভবনটির নামকরণ করা হ'ল 'বঙ্গভবন'। নিজস্ব একটি পাকা ভবন পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু তারপরেই ঘটল ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদের মতো সেই অভাবনীয় ঘটনা। মন্ত্রী গৌতম রায় একদিন ঘোষণা করেছেন যে বঙ্গসাহিত্যের মতো একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগঠন বরাকের গর্ব। অতএব বঙ্গ সংস্কৃতির একটি পীঠস্থান এই শিলচরে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সব রকম সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি বৃহৎ আকারের সুদৃশ্য ভবনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই সরকার, জনগণ ও সম্মেলনে সদস্যদের আর্থিক সহায়তায় তিনি তেমন একটি ভবন গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন। এই পর্বে আমাদের বর্তমান জেলা সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরীর অবদান উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

যা'ই হোক মন্ত্রীমহোদয় তাঁর কথা রেখেছেন। আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর কাজ করেছেন। এখন আমাদের কাজ করে দেখাতে হবে। কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ নয় কারণ আমাদের দায়িত্ব ও কাজের পরিসর অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। তবে আমাদের বিশ্বাস, আমরা পারব। নবনির্মিত বঙ্গভবনে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা সমূহ আমাদের কাজে উৎসাহ যোগাবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। তবে যে কথাটা বলে আমার এই লেখাটার ইতি টানতে চাইছি তা হ'ল সুদৃশ্য এই ভবনটাকে যেন বড় অচেনা ঠেকছে আর ঘুরে ফিরে সেই কাঁচা ঘর ও ছোট পাকা ভবনের স্মৃতি যেন বারেবারে মনটাকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে, কেন কে জানে!

# ব্যাপ্ত চিন্তা ও আদর্শের নির্যাস নিয়ে এগিয়ে চলুক

## পরিতোষ দে

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সৃষ্টি যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা হয়ত তখন স্বপ্নেও ভাবেননি যে একদিন এই সংস্থার একটি নিজস্ব ভবন তৈরি হবে এবং এর মধ্যে সকল আধুনিক সুবিধা-যুক্ত নিজস্ব একটি মিলনায়তনও থাকবে। কিন্তু যাঁরা এর বীজ রোপন করেছিলেন তাঁদের আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়, না হলে আমরা সকলেই অকৃতজ্ঞ হব। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের নিজস্ব এক টুকরো জমি ও এর উপর তৈরি বাঁশের ঘরটা দেখে মনে হত যথেষ্ট হয়েছে, আর যাই হোক সংস্থার'তো একটি নিজস্ব ঠিকানা হল। এরপর আস্তে আস্তে এক তলার দালান বাড়ি তৈরি হল। এটি তৈরি করতে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা যেমন ছিল তেমনি ছিল দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, গৌতম দত্ত ও প্রদীপ আচার্যের কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা। এই বাড়িটি তৈরির সময় থেকেই সাধারণের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একতলার দালান বাড়িটার প্রসারণের সমস্ত সুযোগ রেখে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকেই সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা থেকে কনিষ্ঠরাও চেয়েছেন যে এখানে গড়ে উঠুক বহুতলবিশিষ্ট একটি ভবন, যার বর্তমান রূপ হচ্ছে বঙ্গভবন। সম্প্রসারিত বঙ্গভবনকে যথার্থ রূপ দিতে আসামের মাননীয় মন্ত্রী গৌতম রায়ের সদর্থক ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই সম্প্রসারিত বঙ্গভবন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। এর ফলে এই অঞ্চলের সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশ সহ নতুন প্রজন্মের সার্বিক বিকাশের একটি বড় সুযোগ এসেছে। এই ব্যাপ্ত ও সমৃদ্ধ ভবন তৈরির ব্যাপারে যাঁদের হৃদয়ে ও মননে শুধু একটি চিন্তাই দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে আসাম রাজ্যের গৌতম রায়, শ্যামলকান্তি দেব, তৈমুর রাজা চৌধুরী, সুজন দত্ত এদের নাম উল্লেখ করতেই হয় যাঁদের পরিশ্রম, উপস্থিতি ও সর্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা বঙ্গভবনকে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, নবনির্মিত 'বঙ্গ ভবন' থেকে তার বহু ব্যাপ্ত চিন্তা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের বাসভূমি বরাক উপত্যকার জনজীবনে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন আগামী দিনেও সব ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং প্রতিটি মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে সম্মেলনের সদর্থক ভূমিকা এই অঞ্চলের মানুষের ভাষিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতিকে আরো সুদৃঢ় করবে এ আমার বিশ্বাস।

# স্বপ্নপূরণ

## মোজাম্মিল আলী লস্কর

মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখা মানুষের সহজাত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বপ্ন আমাদের মনের ভেতর যাওয়া আসা করে। যে স্বপ্ন দেখে না বা দেখতে পায় না তাকে জীবন্ত কেমন করে বলি! স্বপ্ন কখনও কখনও মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছার রূপ ধরে মানুষকে সজীব ও সক্রিয় করে তোলে। যে জাতি স্বপ্ন দেখতে জানে না সে জাতি নিজের ভবিষ্যতে নিজে রচনা করতে পারে না। আমার কাছে স্বপ্ন আল্লার অশেষ আশীর্বাদের মধ্যে একটি।

বঙ্গভবন গড়ে উঠেছে। বঙ্গভবন আমাদের স্বপ্নের সেই ইমারত যা বংশ পরম্পরায় আমাদের পথ দেখাবে। বঙ্গভবন আছে মানে আমরা আছি। বঙ্গভবনের অস্তিত্ব যদি কোনদিন বিলোপ হয় তবে তার পূর্বেই বাঙালি জাতি হিসাবে আমরা মরে যাব।

বঙ্গভবনের মতো এক ভবন এবং আরো অনেক কিছু নির্মাণের স্বপ্ন আমি দেখতাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য!

বঙ্গভবন হয়েছে কিন্তু তাতে আমার যোগদান খুব কম। এই আফশোশ থেকে গেল। আমি তৈমুর ও তার সহযোগীদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি। কী নিষ্ঠার সঙ্গে তারা কাজ করেছে! যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়ার মাঝে মহত্ব লুকিয়ে থাকে। বঙ্গভবন নির্মাণে যারা যুক্ত হয়েছেন দান করেছেন আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা রাখব যে শুভেচ্ছা নিয়ে বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা যেন সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়। বঙ্গভবন আমাদের গর্বের প্রতীক হোক। বঙ্গভবন এ অঞ্চলের নব নব কাব্য-সাহিত্য-নৃত্য-নাটক সৃষ্টির আঁতুড়ঘর হোক্।

# আমার ভাবনায় বঙ্গভবন

## তমোজিৎ সাহা

বঙ্গভবনের কথা বললে আমার কানে 'বঙ্গভুবন' শব্দটি ধ্বনিত হয়। যতই নির্বাসিতা হোক না কেন আমাদের প্রাণের বরাকভূমি তো আসলে ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গভূমিরই অভিন্ন অঙ্গ। এই সত্যটি প্রাণমনে স্পন্দিত হয় বলেই ঐতিহ্যবিস্মৃত এই প্রান্তিক ভূমিতে থেকেও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ও প্রচার প্রসারের গভীর অর্থ এবং প্রয়োজন খুঁজে পাই। সম্প্রসারিত বঙ্গভবন আমাদের আত্মপরিচয়ের স্মারক হয়ে থাকবে, শুধু তাই নয় ভবিষ্যতের সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠলে বলে আমার বিশ্বাস। শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নয়, বহুভাষিক বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক এবং ভাষিক চরিত্র রক্ষার জন্য বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের নেতৃত্বকারী ভূমিকা আরও দৃঢ় হবে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভাষিক এবং জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী দিশারীর ভূমিকা পালন করবে, পূর্বতন ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলে এই বঙ্গভবন নতুন ইতিহাস তৈরি করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের ইতিহাসচর্চার অভিলেখ্যাগার হয়ে উঠুক বঙ্গভবন।

# আমার বঙ্গভবন

## শ্যামলকান্তি দেব

শিলচর শহরের প্রাণকেন্দ্র এই মনোরম প্রাসাদটির দিকে চোখ পড়লেই কিছু পুরনো স্মৃতি মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দেয়। আমি সংগঠনের সরকারি জমি প্রাপ্তি বা ভবন নির্মাণ অর্থের সংস্থান তথা পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে কিছু বলছি না। স্মরণিকাতে নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত একাধিক আলোচনা থাকবে। আমার মনে পড়ে সেই সভাটির কথা সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে ভবনটির নামকরণ সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে সামান্য মতান্তর হয়। অবশ্য সেদিন কিন্তু গ্রহণযোগ্য বিকল্প নাম উত্থাপন হয়নি।

আজ কালচক্র অতিক্রম করে আমার প্রত্যয় ভবনটির অন্য কোন নামকরণ যথাযথ উদ্ভাসিত করতে পারত না। বরাক উপত্যকার কৃষ্টি সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে 'বঙ্গভবন' আমার হৃদয়তন্ত্রে বিশেষ অনুরণন তোলে।

# আমার অনুভবে বঙ্গভবন : কিছু প্রশ্ন

চিত্রভানু ভৌমিক

বঙ্গভবন — আমার চোখের সামনেই সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত, হৃদয়-লালিত স্বপ্ন ধীরে ধীরে কংক্রিট স্টিল আর প্রযুক্তির মেলবন্ধনে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, যা হবে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বৌদ্ধিক চর্চার কেন্দ্র। স্বপ্ন সাধারণত স্বপ্নই থেকে যায়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বঙ্গভবন, আসলে অর্থাভাব কখনই এই মহৎ কাজের অগ্রগতির বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই ধন্যবাদ প্রাপ্য সেইসব দাতাদের যাদের বদান্যতায় বঙ্গভবন আজ এই শরীরী রূপ পেয়েছে।

কিন্তু এ'তো গেল তার বর্হিরঙ্গের কথা, কিন্তু অন্তরে? সেকি প্রস্তুত হচ্ছে এ অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতির সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য? প্রস্তুত হচ্ছে সমস্ত ভাষিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর পরম্পরাগত সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণে? এই বঙ্গভবন কি হয়ে উঠতে পারবে এ অঞ্চলের মানুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর?

নাকি অন্যকিছু 'বড় প্রতিষ্ঠানের' মত ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ের কেন্দ্র হয়ে উঠবে এ প্রতিষ্ঠান? এই সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে আমার অনুভবের বঙ্গভবনের সম্পূর্ণ হয়ে উঠার মূল চাবিকাঠি।

# আমার বঙ্গভবন

## শেখর দেবরায়

বঙ্গ সংস্কৃতির বিশাল বটবৃক্ষের ছায়াতলে স্বচ্ছতার নিশ্বাস নেবার অবিরাম প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় যাঁরা কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন-তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলিষ্ঠ সংগঠন 'বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন'।

এই মাটি আলো হাওয়া রোদ্দুরের মাঝে সৃষ্টিশীল শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সার্বিক উন্নতিকল্পে বরাক উপত্যকার 'বঙ্গভবন' আগামী দিনেও উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে যাবে এটাই আশা রাখি।

বহুমান যেকোন প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমরা যেন সবাই একযোগে প্রজন্মের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারি এবং সেটাই হবে স্বপ্নের 'বঙ্গভবন' নির্মাণের অভীষ্ট।

# অস্তিত্বের ঠিকানা

## সুজিত দাস

বঙ্গভবন এই উপত্যকার মানুষের অস্তিত্বের ঠিকানা। এই বঙ্গভবনের সংগ্রহালয়ে সঞ্চিত থাকবে সব নথি যা আগামীদিনের গবেষকদের রসদ যোগাবে। আধুনিক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ শিলচর শহরের অলংকারস্বরূপ আমাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে। আমি এই সংগঠকের এক সদস্য হিসাবে গর্ব বোধ করি।

# বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

* বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক, অপেশাদার, অরাজনৈতিক সংস্থা।
* এতঞ্চলে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা, প্রসার ও উন্নয়ন সাধন এবং বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা, চিন্তা ও গবেষণা করা।
* সমমতাবলম্বী অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সুসম্পর্ক স্থাপন ও বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গেও অনুরূপ সুসম্পর্ক স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রতিভা বিকাশে সহায়তা ও সহযোগিতা করা।
* গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপন, আলোচনা চক্র, সাহিত্যবাসর, প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সম্মেলন ইত্যাদি সংগঠিত করা।
* বরাক উপত্যকার লেখক-লেখিকা ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিদের পুস্তকাদির মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা এবং ওই ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।
* এই অঞ্চলের গ্রামগঞ্জ, বাগান ও শহর এলাকাসমূহ থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনসমূহ উদ্ধার করা।
* উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ও শিল্পীকে আর্থিক সহায়তা করা।
* 'সম্মেলনের' কার্যনির্বাহের ও বিভিন্ন কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সূত্র থেকে সাহায্য ও সহায়তা গ্রহণ করা।
* 'সম্মেলনের' স্বার্থে সম্পদ আহরণ, হস্তান্তর ও বিক্রম করা।
* বরাক উপত্যকা ও তৎসংলগ্ন যে কোনও স্থানে 'সম্মেলনে'র শাখা এবং পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপন ও তদুদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি সূত্র হইতে আর্থিক সাহায্য, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
* নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও অস্পৃশতা ইত্যাদি বর্জনকল্পে বিবিধ সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমের রচনা ও রূপায়ণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির প্রসার।
* বরাক উপত্যকার কৃতি সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও গুণিজ্ঞানী ব্যক্তিগণকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজসেবামূলক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মানজনক পুরস্কার, পদক, মানপত্র ইত্যাদি প্রদান করা।

## ভবন সংক্রান্ত কতিপয় নথি : ১

Copy of letter No.RSS.193/2004/25 dtd.Dispur, the 30th Sept/2004, from Deputy Secretary to the Govt.of Assam, Revenue (Settlement) Department, Address to the Deputy Commissioner, Cachar, Silchar.

---

Sub : Allotment of land in the name of Barak Upatyaka Bange Sahitya and Sanskrity Sammelan, Silchar.

Ref : No.CRS.26/2003/18 dtd.25-3-2004.

With reference to your letter on the subject cited above, I am directed to say that the Governer of Assam is pleased to order for allotment of Govt. Khas land measuring 5 Kathas covered by Dag No.2580 under Mouza Silchar Town, Pt-V, Ph-Barakpar in favour of Barak Upatyaka Bange Sahitya and Sanskrity Sammelan, Silchar. Subject to utilisation for the specific purpose within 3 (three) years, falling which the land so alletted will automatically stand cancelled and reverted to Govt. in Revenue (Settlement) Department.

The land records may be got corrected accordingly after handing over possession of the land to the Barak Upatyaka Bange Sahitya and Sanskrity Sammelan, Silchar.

One copy each of the trace map and chitha of the land received with your letter under reference are returned for necessary action.

---

Memo No.CRS.26/2003/20-A Dated Silchar, the 02/11/2004

Copy alongwith its enclosures are forwarded to the Settlement Officer, Cachar & Hailakandi, Silchar for information. She is requested to take necessary action as desired by Govt.at an early date.

2. The President, Barak Upatyaka Banga Sahitya and Sanskrity Sammelan, Silchar for information.

(B.C. Nath)
Addl.Deputy Commissioner,
Cachar, Silchar.

নথি : ২

GOVT.OF ASSAM.
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER ::: CACHAR ::: SILCHAR

NO.CRS.26/2003/19 Dated Silchar,the..1-4-2004.

To,

The Commissioner and Secretary to the
Govt.of Assam,
Revenue (Settlement) Department.
Assam(Civil) Secretariat,Dispur.
Guwahati-6.

Sub : Allotment of land in the name of

1) Barak Upatyaka Bango Sahitya and Banskrity Sammelan, Silchar.

And

2) District Bridge Association,Silchar.

Sir,

In continuation of this office letter No.CRS.26.03/08 dt.20.3.04, I have the honour to state that while sending the proposals it has been inadvertently used the word "Settlement instedd of "Allotment" in the 2nd line of the letter under reference and to request you kindly to read "Allotment" in place of "Settlement" in consonance with the Resolution No.8 and 15 of the Meeting of the S.L.A.C. already forwarded.

Yours faithfully,

(S.Sengupta) 1/4
Deputy Commissioner.
Cachar,Silchar.
1/4/04

নথি : ৩

GOVT. OF ASSAM
OFFICE OF THE SETTLEMENT OFFICER::::CACHAR & HAILAKANDI
DISTRICTS::::::SILCHAR

NO. CSO. 300/2004/850 Dated the 15th June 2004.

To

The Asstt. Settlement Officer,
Sonai/ Katigorah/ Udharbond/ Lakhipur circle.

Sub : Proposal for allotment of Govt. Khas land in favour of Barak Upattaka Bange Sahitya Sammaloh.

With reference to the subject mentioned above it appears that some petitions in original were sent to your office for submission of suitable Govt. Khas land allotment proposal in favour of Barak Upattaka Bange Sahitya Sanskriti Sammalen. You are, therefore, requested to find out suitable plot of land as per requirement of the applicant's organisation. You may also fix programme with the president/ secretary, Barak Upattaka Bange Sahitya Sanskriti Sammalen for this purpose.

Sd/-
( B. Dutta )
Settlement Officer, Cachar &
Hailakandi Districts, Silchar.

Memo No. CSO. 300/2004/850-A Dated the 15th June 2004.

Copy to :

The President, Barak Upattaka Bange Sahitya Sanskriti Sammalen for information. He is requested to keep close contact with Asstt. Settlement Officers concerned for the prupose.

15/6/04
( B. Dutta )
Settlement Officer, Cachar &
Hailakandi Districts, Silchar.
15/6/04.

নথি : ৪

GOVERNMENT OF ASSAM
OFFICE OF THE ASSTT. SETTLEMENT OFFICER: : : SADAR CIRCLE: SILCHAR.

We the Undersigned this the 29th Day of November/04 formally handed over and taken over the Physical Possession of the following Schedule of Land as per Govt. Order No. RSS.193/2004/25 dtd. 30th September/2004 communicated vide Addl. Deputy Commissioner, Cachar's letter under Memo NO. CRS.26/2003/20-A dtd. 2/11/04.

Schedule of Land.

Mouza:- Silchar Town Pt-V.

Pergona:- Barakpar.

2nd R.S. Dag No. 2580

Area:- 5(Five) Katha.

Taken over Possession.

Dinendra Narayan Biswas
সভাপতি 29/11/04
কাছাড় জিলা সমিতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

Handed over Possession.

Asstt. Settlement Officer,
Sadar Circle: : : Silchar.

Memo No. SCSM.34/04/1127 Dated, Silchar, the 29-11-04

Copy to:-

(1) The Addl. Deputy Commissioner, Cachar for favour of Kind information.

(2) The Settlement Officer, Cachar & Hailakandi Districts Silchar for favour of kind information.

(3) The President Barak Upatyaka Bango Sahatya & Sanskrity Sammelan Silchar for ingormation.

Asstt. Settlement Officer,
Sadar Circle: : : Silchar.

নথি : ৫

Copy of letter No.RSS.193/2004/47 dtd.Dispur.the 9th December,2005,from Joint Secretary to the Govt.of Assam, Revenue (Settlement) Department,address to the Deputy Commissioner,Cachar,Silchar.

---

Sub : Allotment of land in favour of Barak Upatyaka Bango Shahitya Sanskrity Sammelan.

Ref : Your letter No.CRS.7/2003/80 dtd.4-5-2005.

With reference to your letter on the subject cited above, I am directed to say that the Governor of Assam is pleased to order for allotment of sarkari land/land measuring 4(four) katha covered by Dag No.2nd R.S.2560 under Silchar Town Mauza Part-5 Ph.Barakpar in favour of Barak Upatyaka Bango Shahitya Sanskrity Sanmelan,subject to utilisation for the specific purpose within 3(three) years, failing which, the land so allotted will automatically stand cancelled and reverted to Govt. in Revenue (Settlement) Department.

The land records may be got corrected accordingly after handing over possession of the land to the Barak Upatyaka Bango Shahitya Sanskrity Sammelan.

One copy of the trace maps and chithas of the land received with your latter under reference are returned for necessary action.

---

Memo No.CRS.26/2003/22-A Dated Silchar,the 16/12/05.

Copy forwarded to the Asstt.Settlement Officer,Sadar for information with a request to take necessary action as desired by Govt.at an early date.

2. The President,Barak Bango Sahitya Sanskrity Sammelan Silchar for information.

Addl.Deputy Commissioner,
Cachar,Silchar.

**নথি : ৬**

Office of the Chairman : Silchar Development Authority : Silchar

No. SDA 6/Ob-P/2006—2007/03  Silchar Dated, Silchar. the 5/7/06

To. Sri/~~Smti~~ The President.

Barak Upatyaka Bango Sahatya, Silchar

**SUB : PERMISSION FOR CONSTRUCTION OF BUILDING/BOUNDARY WALL ETC.**

Dear Sir,

You are hereby allowed to construct the RCC/~~Semi RCC/ Assam Type~~ Building/Boundary wall as per enclose approved Drawing design with the setback as follows : on

Dag No. 2580 (2ND RS) Mouza Silchar town

Patta No. ——— Ward No. ~~24~~ 6 (Six)

| | Boundary Wall | Ground Floor | 1st Floor | 2nd Floor | 3rd Floor | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern | / | 7'92m. | 5'80m | 5'80m. | | | |
| Western | / | 0'91m | 0'91m | 0'91m. | | | |
| Northern | / | 2'44m | 0'91m | 0'91m. | | | |
| Southern | / | 0'91m | 0'91m | 0'91m | | | |
| Used Allowed | / | Pulla | — Semi- | Pullia cene | | | |
| Area Allowed | / | 369'99m | 425'17m | 425'17m | | | |
| Height | / | 3'35m | 3'35m | 3'35m | | | |

Please note the following items & conditions :

1. Lay out of the proposed building/~~boundary wall~~ shall be verified by this office, therefore before commencement of the work, the undersigned is to inform accordingly for necessary verification etc.
2. Construction work of the R. C. C building are to be done under supervision of a qualified Civil Engineer as per approved plan, drawing ~~design~~ and set-back.
3. Before occupation of the building either in part or whole occupancy certificate is to be obtained from the undersigned which will be only on production of the certificate from the attending Qualified Civil Engineer (who supervised the construction work) with the following comments.

Enclo: Approved Drawing/plan/Plan & Design
2 Cross Section of Culvert
(Annexure -1)

Yours faithfully

5/7/06

Chairman

Silchar Development Authority

N.B. : 1. This permission is valid upto one year from the date of issue of this order if work is not started within one year renewal will be required before expiry of 1 (one) year.
2. If any violation is detected at any stage during the construction, necesary action will be taken as per provision of Assam Town & Country Planning Act 1959 (as amended).
3. Any facts if found misleading to Silchar Development Authority this permission is liable to be cancelled.
4. The drainage system etc. must be properly maintained by the applicant.
(5) Rain water should fall in their own land

নথি : ৭

Notice U/S. 94 (2) of the Assam Municipal Act, 1956.

To
Shri/Smti President Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan, Cachar Zila Samiti; Silchar
Holding No 29/A of ward No. 6
SILCHAR.

This is to inform you that your holding is assessed/the assessment of your holding is increased with effect from 4th qrtr quarter of 19 2007-08.

The annual value of the holding and the quarterly taxes thereof are noted below.

| Holding No | Name of ward, | Annual Value | Quarterly taxes, House | Latrine | Water | Light. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29/A | 6 | 4215.00 | 84.30 | — | — | 42.15 |

Quarterly tax - 126.45

Date 11th Dec-07.

SILCHAR MUNICIPAL BOARD * SILCHAR *

Chairperson
Executive Officer,
Silchar Municipal Board
Silchar Municipality.

নথি : ৮

**GOVERNMENT OF ASSAM**
**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER: CACHAR: SILCHAR**
**(DEVELOPMENT BRANCH)**

**No. CDP(Plan) 3/2008-09/2** **Dated Silchar the 22nd May' 2008.**

To,

The Addl. Chief Secretary
To the Govt. of Assam,
Planning and Development Department,
Dispur, Guwahati -6.

Sub: Const. of building of Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan at Silchar.

Sir,

With reference to the subject cited above, I have the honour to inform you that the Secretary, Cachar District Committee, Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan, Silchar has prayed for sanction of Rs. 1,33,54,000.00 (rupees one crore thirty three Lakh fifty four thousand) only for Const. of building of Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan at Silchar under Untied Fund.

A copy of detailed plan and estimate is enclosed herewith for favour of your kind necessary action.

Yours faithfully,

Enclo. As stated above.

(G. Ganguly)
Deputy Commissioner,
Cachar, Silchar.

**Memo. No. CDP(Plan) 38/2008-09/2-A** **Dated Silchar the 22nd May' 2008.**

Copy to :

The Secretary, Cachar District Committee, Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan, Silchar for information.

22/5/08

(G. Ganguly)
Deputy Commissioner,
Cachar, Silchar.

নথি : ৯

GOVT. OF ASSAM
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER ::: CACHAR ::: SILCHAR.
*****

NO. CRS. 26/2003/37 Dated Silchar, the 10th June, 2009

To

The Joint Secretary to the Govt. of Assam,
Revenue & Disaster Management Department,
(Settlement Branch), Dispur,
Guwahati-6.

Sub:- **Allotment of additional land in favour of 'Barak Upatyaka Bongo Sahitya & Sanskriti Sanmelon'.**

Ref:- **This Office letter No.CRS. 26/2003/26, dtd. 03-12-2007 (Copy enclosed)**

Sir,

With reference to the subject cited above, I have the honor to state that a letter was moved to Govt. under reference in connection with construction for allotment of additional land in favour of 'Barak Upatyaka Bongo Sahitya & Sanskriti Sanmelon'.

In view of the above, Govt is further requested to take necessary action on the matter.

In this connection, Trace map & chitha copy in duplicate are enclosed herewith for favour of your kind information & necessary action.

Enclo:- As stated above
Total 5 (five) Sheets.

Yours faithfully,

Addl. Deputy Commissioner,
Cachar, Silchar.
10/6/09

নথি : ১০

**GOVT. OF ASSAM**
**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER ::: CACHAR ::: SILCHAR.**
*****

**NO. CRS. 26/2003/38,** **Dated Silchar, the 12 Noveber,2009**

**To**

**The Joint Secretary to the Govt. of Assam,**
**Revenue & Disaster Management Department,**
**(Settlement Branch), Dispur,**
**Guwahati-6.**

**Sub:-** **Report on allotment of additional land in favour of 'Barak Upatyaka Bongo Sahitya & Sanskriti Sanmelon'.**

**Ref:-** **This office letter No.CRS.26/2003/26 dtd.03-12-07 & No.CRS.26/2003/37 dtd. 10-06-2009.**

**Sir,**

With reference to the subject cited above, I have the honour to state that letters were moved to Govt. under reference in connection with construction for allotment of additional land in favour of 'Barak Upatyaka Bongo Sahitya & Sanskriti Sanmelon.

In this connection, a copy of this office letters mentioned under reference and a copy of Trace map, Chitha are enclosed herewith.

It is stated that the proposal was placed before the Sub-Divisional Land Advisory Committee meeting held 0n 29-08-2009 vide Resolution No.16 of the Agenda. The proposal was discussed at length by the Members of the SDLAC & approved it. Copy of the minutes of the SDLAC meeting held on 29-08-2009 is enclosed herewith for ready reference of the Govt.

This has the approval of Deputy Commissioner, Cachar.

This is for favour of kind information & necessary action.

Yours faithfully,

Enclo:- As stated above.
06 (six) sheets.

Addl. Deputy Commissioner,
Cachar, Silchar.

# শিলচরে বঙ্গ সাহিত্যের ভবন নির্মাণে অর্থ প্রদান

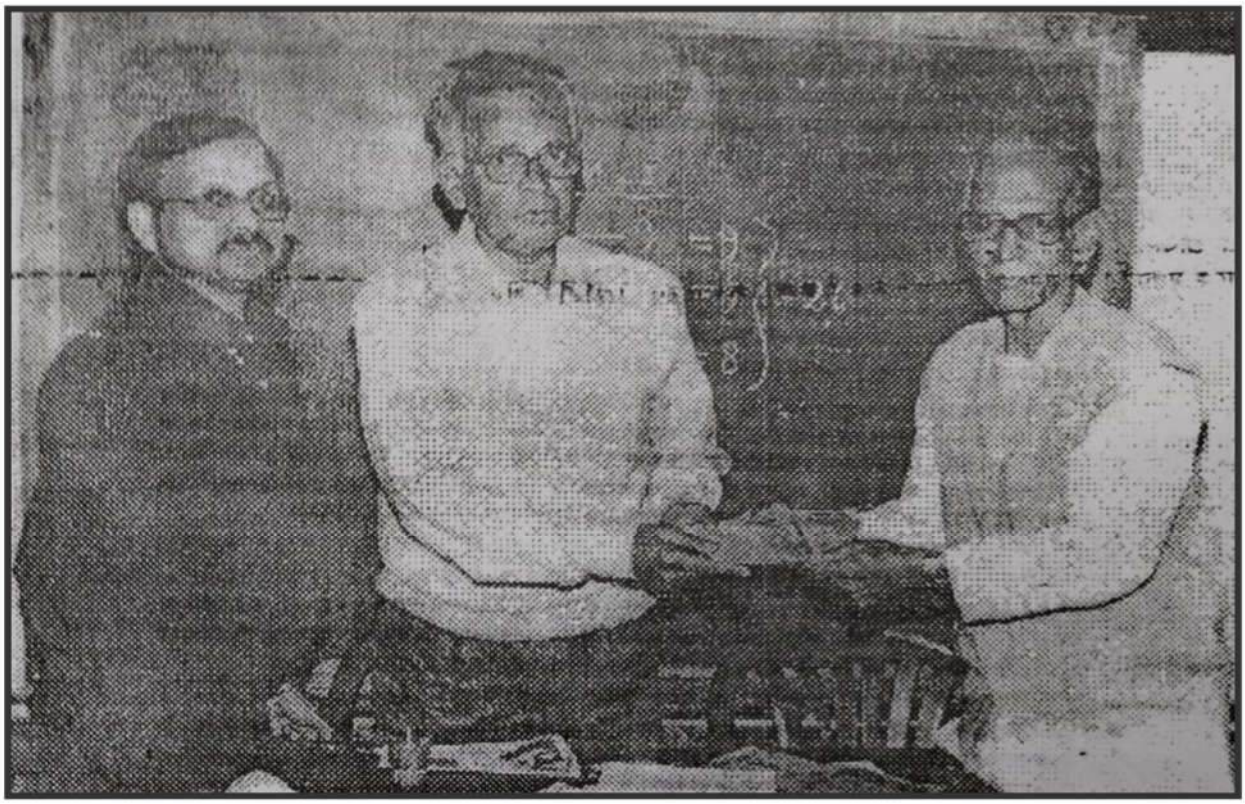

শিলচর বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা কমিটির ভবন নির্মাণের জন্য সংস্থার একাদশ অধিবেশনের উদ্বৃত্ত অর্থের ড্রাফ্ট কোষাধ্যক্ষ অনন্ত দেব জেলা কমিটির সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসের হাতে তুলে দিচ্ছেন। পাশে জেলা কমিটির সম্পাদক প্রদীপ আচার্য। ছবি : নিজস্ব

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা কমিটির একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত এই ভবনটি তৈরির প্রাথমিক কাজকর্ম আরম্ভ করার জন্য শিলচরে অনুষ্ঠিত সংস্থার একাদশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ অনন্ত দেব ওই অধিবেশনের উদ্বৃত্ত অর্থ এক লক্ষ তিন হাজার ন'শ কুড়ি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট সম্প্রতি জেলা কমিটির এক বর্ধিত সভায় সভাপতি দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসের হাতে তুলে দেন। ওই অর্থ এতদিন স্থানীয় ইউকো ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল।

নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা কমিটির ওই সভায় সম্মেলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উদ্বৃত্ত অর্থ গচ্ছিত রেখে জেলা কমিটির হাতে যেভাবে তুলে দিয়েছেন সে জন্য অনন্ত দেবের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় জেলা কমিটির নিজস্ব ভবন অনেকদিন আগেই নির্মিত হলেও শিলচরে আজ পর্যন্ত জেলা কমিটির ভবন হয়নি। দু'জেলাতে ভবন নির্মিত হওয়ার পরও শিলচরে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ভরন নির্মাণ না হওয়ায় জনমনে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। অবশ্য সম্প্রতি একটি নির্মাণ উপ-সমিতি গঠিত হয়েছে।

## সম্মেলনের সূচনালগ্নে প্রথম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

**শোকপ্রস্তাব**

কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন বর্তমান বৎসরে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, জনপদ কবি জসীম উদ্দীন, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কবি ও সুলেখক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, সুলেখক কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক এবং পণ্ডিত যোগিরাজ বসুর পরলোক গমনে সুপরীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং প্রার্থনা করিতেছে যে তাঁহাদের প্রয়াত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

প্রস্তাব নং - ২

(২) এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে কাছাড়ের কৃতী সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও কবিবৃন্দকে তাঁহাদের গ্রন্থাদি প্রকাশনার ব্যাপারে অর্থানুকূল্য এবং তাঁহাদের প্রতিভার যথাযোগ্য স্বীকৃতি এবং পুরস্কার ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য পানের জন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক - অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরী সমর্থক - শ্রীতারাশঙ্কর পুরকায়স্থ

(৩) কাছাড়ের জেলা-গ্রন্থাগার ও মহকুমা গ্রন্থাগায় সমূহের পুস্তক সংখ্যা অপ্রতুল। এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সুখপাঠ্য আধুনিক ও প্রাগাধুনিক উপন্যাস, কাব্য, নাটকের সংগ্রহ যেমন অকিঞ্চিৎকর তেমনি নৈরাশাব্যঞ্জক ও সর্বোপরি বাঙলা-ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের চর্চা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের একান্ত অভাব দেখিয়া এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে কাছাড় জেলা গ্রন্থাগার এবং মহকুমা গ্রন্থাগার সমূহকে সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক - অধ্যক্ষ দেবব্রত দত্ত সমর্থক - শ্রীমতী যুথিকা দাস

(৪) বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত সর্ববিষ পাঠ্য পুস্তকে, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান, কারিগরী, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, স্বাস্থ্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অন্য ভাষা হইতে অনূদিত বাঙলা গ্রন্থে এবং বাংলা সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তকেও মারাত্মক এবং হাস্যকর প্রমাদ দর্শনে এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে পাঠ্য পুস্তকাদিকে সর্বপ্রকারে ত্রুটিমুক্ত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হউক এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ বিধায় জন্য যথোপযুক্ত যোগ্যারা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হউক।

প্রস্তাবক - অধ্যাপক শক্তিপদ ব্রহ্মচারী সমর্থক - শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্তী ও অধ্যাপক বিজিত ভট্টাচার্য

(৫) অসম প্রকাশনী পর্ষদ এযাবৎকাল আসামে বাঙলা ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি প্রকাশ করে নাই এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, অসম প্রকাশনী পর্ষদকে আসামে বাঙলা ভাষায় লিখিত উপযুক্ত এবং উত্তমমানের পুস্তকাদি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহী হইতে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক - অধ্যাপক জগন্নাথ রায়চৌধুরী সমর্থক- শ্রীপ্রভাত রঞ্জন চন্দ

(৬) বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, আকাশবাণীর কেন্দ্রের অনুষ্ঠানাদির পরিচালন ও উহাদের মানোন্নয়নের জন্য তিন মহকুমার বুদ্ধিজীবি ও বৃত্তিভিত্তিক প্রতিনিধি লইয়া উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন, কেন্দ্রটিকে বেতার তরঙ্গ প্রেরণের দিক দিয়া শক্তিশালী এবং স্থানীয় সংখাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা করায় জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক – এ. এফ. গোলাম ওসমানি সমর্থক - শ্রীসনৎ কুমার চক্রবর্তী

**প্রস্তাব নং ৭(ক)**

(১) কামাড়ের প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ অনুসন্ধান ও তদ্বিষয়ে গবেষণা।

(২) কাছাড়ের বঙ্গ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক বাবস্থা গ্রহণ।

(৩) অন্যান্য ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃকিভুক্ত জনগণের সঙ্গে সৌভাতৃত্বমূলক সম্পর্ক ও যৌথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও মৈত্রী সৃষ্টির দ্বারা জাতির সংহতি প্রতিষ্ঠার সহায়তা অর্থাৎ কাছাড় জেলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও প্রয়াসগুলিকে সুষ্ঠভাবে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ করিয়া দিবায় জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া মৈত্রী ও এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বিনিময় ও সমন্বয়ের জন্য এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ববিধ উন্নতির জন্য "কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির" এই সম্মেলন প্রস্তাব করিয়েছে যে, "কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন" এই নাম নিয়া একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করা হউক এখং অদ্যকার এই প্রকাশ্য সম্মেলনে সেই উদ্দেশ্যে শিলচর, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি মহকুমার নিম্নলিখিত সদস্য লইয়া একটি অস্থায়ী কমিটি (অ্যাড্হক কমিটি) পঠন করা হউক। এই কমিটি প্রয়োজন বোধে আরও সদস্য অধিগ্রহণ করিতে পারিবে এবং সাতজনের উপস্থিতিতে কমিটি কর্তৃক আহুত সভা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

আরও প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, উক্ত অস্থায়ী কমিটিকে "কাছড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের" জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের ভার, তাহ্য গ্রহণ এবং সম্মেলনের পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে উপস্থাপনের দারিত্ব অর্পণ করা হউক। উক্ত কমিটি পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে সংবিধানটি পাকাপাকি ভাবে গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংবিধান অনুসারেই কাজ চালাইয়া যাইবে এবং মহকুমা, আঞ্চলিক, গ্রাম ও মহল্লা ডিতিক অস্থায়ী কমিটি গঠন করিয়া সম্মেলনের বর্তমান অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবিত কার্যকরী করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) পূর্ববর্ণিত "ক" বিভাগীয় প্রস্তাবের ১ এবং ২ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়াদিও সুষ্ঠ রূপায়ণের জন্য কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধীনে একটি কাছাড় প্রকাশন পর্ষদ গঠন করা হউক এবং উহার পরিচালনাভার একটি স্থায়ী পর্বদের (Board Trustees) উপর ন্যস্ত করা হউক।

(গ) উপরোক্ত প্রকাশন পর্বদ স্থানীয় শিল্পী সাহিত্যকদের বামাড়ের মনীষীদের নামাঙ্কিত পুরস্কার দেওয়ায় ব্যবস্থা নিবেন।

প্রস্তাবক - শ্রীপ্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী সমর্থক – শ্রীঅনন্ত দেব।

প্রস্তাব নং : ৮

# কার্য নির্বাহক সমিতি

সভাপতি : শ্রী প্রিয়নাথ দেব
সহ-সভাপতি : শ্রী মোহরাব আলী লস্কর
শ্রী দেবব্রত দত্ত
শ্রী সুসিত কুমার দত্ত
সাধারণ সম্পাদক: শ্রী প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: শ্রী জগন্নাথ রায়চৌধুরী
শ্রী অনন্ত কুমার দেব

কোষাধ্যক্ষ : শ্রী সুখরঞ্জন চন্দ

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ : -

শ্রী করুণা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রী পরিমল দে, শ্রী প্রভাত রঞ্জন চন্দ, শ্রী বিনোদ বিহারী দাস, শ্রী এ,এফ, গোলাম ওসমানী, শ্রী ভক্তি-মাধব চট্টোপাধ্যায়, শ্রী আব্দুল কদ্দুছ লস্কর, শ্রী শরৎ চন্দ্র নাথ, শ্রী প্রভাস সেন মজুমদার, শ্রী কান্তি ভূষণ সেন, শ্রী পুষ্প রঞ্জন গুপ্ত, মো: মহীউদ্দীন, শ্রী বিনোদ বিহারী দাস, শ্রী শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রী নৃপেন্দ্র নারায়ণ বনিক, শ্রী মনোরঞ্জন দেব, শ্রী অনুরূপা বিশ্বাস, শ্রী নলিনী কান্ত দাস, শ্রী মিলন শশী মজুমদার, সুজিৎ চৌধুরী, শ্রী প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, শ্রী বিজয় মাধব ভট্টাচার্য্য, খালেক চৌধুরী, অতুল রঞ্জন দেব, শ্রী আশীষ চৌধুরী, শ্রী অসিত চক্রবর্তী, সুভাষ চন্দ্র কর্মকার, শ্রী কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রী হাছন রাজা লস্কর, শ্রী বিজিত ভট্টাচার্য্য, শ্রী শক্তিধর চৌধুরী,

প্রস্তাবক :- শ্রী কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সমর্থক :- অধ্যাপক অংশুমান ভট্টাচার্য্য

সমস্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত —

**রামেন্দ্র দেশমুখ্য**

*সভাপতি*

২৫ পৌষ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, (১ জানুয়ারী, ১৯৭৭)

# TOTAL SANITATION CAMPAIGN HAS BEEN RENAMED AS NIRMAL BHARAT ABHIYAN

## The main objective of the NBA are as under

Shri Gautam Roy,
Hon'ble Minister P.H.E.,
Assam

a) Bring about an improvement in the general quality of life in the rural areas.

b) Accelerate sanitation coverage in rural areas to achieve the vision of Nirmal Bharat by 2022 with all gram Panchayats in the state attaining Nirmal Status.

c) Motivate communities and Panchayati Raj Institutions promoting sustainable sanitation facilities through awareness creation and health education.

d) To cover the remaining schools not covered under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Anganwadi Centre in the rural areas with proper sanitation facilities and undertake proactive promotion of hygiene education and sanitary habits among students.

e) Encourage cost effective and appropriate technologies for ecologically safe and sustainable sanitation.

f) Develop community managed environmental sanitation systems focusing on solid & liquid waste management for overall cleanliness in the rural areas.

Shri Tarun Gogoi
Hon'ble Chief Minister,
Assam

**CHIEF ENGINEER (PHE) B&S**
**CUM**
**EXECUTIVE DIRECTOR, SLEC, RGRWSM**
**ASSAM :: :: :: :: :: :: HENGRABARI**
**G U W A H A T I - 36**

Printed at SILCHAR SUNGRAPHICS, Premtola, Silchar-1